

উস্তাদ নোমান আলী খান-এর লেকচার অবলম্বনে



বক্তন



NAK RANGLA

বন্ধন

উস্তাদ নোমান আলী খান

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

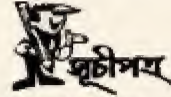
① ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮

০২-৫৭১৬৫৫১৭

guardianpubs@gmail.com

www.guardianpubs.com

পরিবেশক



৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৫৫২-৪৫১৫৯২

অনলাইন পরিবেশক:

www.rokomari.com

www.boibajar.com

প্রথম প্রকাশ : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

গ্রন্থত্ব : লেখক

শব্দ বিন্যাস : মো : জাহিরুল ইসলাম

প্রচ্ছদ : আহমেদ ইসমাইল হুদয়

মুদ্রণ : মো : আমিনুল ইসলাম

মূল্য : ২৫০.০০

ISBN- 978-984-92959-9-0

Bondhon by Ustadh Nouman Ali Khan.

Published by Guardian Publication, Price Tk. 350 Only.

প্রকাশকের কথা

পরিবার মানেই কতক হৃদয়ের সামষ্টিক মেলবন্ধন, আত্মিক টানে একত্রে বসবাস। যেখানে আছে জীবনের সহজাত প্রবাহ, আছে স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালোবাসা। আছে উষ্ণ আবেগ, অভিমান এবং যত্ন-আন্তি-পরিচর্যার সম্মিলন। পারিবারিকই মানুষের প্রথম পাঠশালা। ইসলামি সমাজব্যবস্থায় পারিবারিক কাঠামোর এক বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা আছে। মজবুত ইসলামি সমাজব্যবস্থা মূলত পারিবারিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে চলমান বিশ্বায়নের তথাকথিত প্রগতি ও আধুনিকতার প্রভাবে পশ্চিমা দুনিয়ার সাথে মুসলিম পারিবারিক ব্যবস্থাপনাতেও আঘাত আসছে। অত্যন্ত সুকৌশলে ইসলামি সমাজের প্রাথমিক এই ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে পরিবার। সাথে ভাঙছে হৃদয়ের বন্ধন! এ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

উস্তাদ নোমান আলী খান এই চ্যালেঞ্জকে মুসলমানদের সামনে এনেছেন। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে প্রতিনিয়ত ব্যাপারগুলো খোলাসা করছেন। সমসাময়িক ইস্যু, মুসলিম মানসের সঙ্কট, তরুণ প্রজন্মের চ্যালেঞ্জ ও সঙ্কটকে অনুপম ভাষায় সহজবোধ্য করে উপস্থাপনায় উস্তাদ নোমান আলী খান অনন্য মাত্রায় পৌঁছেছেন। সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশের তরুণদের মাঝেও তিনি দারুণ জনপ্রিয়। ইউটিউবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর উস্তাদের অনেক ভিডিও বক্তব্য আছে। বাংলাদেশে একদল তরুণ উনার ভিডিওগুলোকে বাংলায় ডাবিং করে বাংলাভাষীদের কাছে উপস্থাপন করে যাচ্ছে। একই সাথে তারা ভিডিও বক্তব্যগুলোকে লেখ্যরূপে পাঠকদের জন্য প্রস্তুত করছে। পারিবারিক জীবনসংক্রান্ত উস্তাদের বিভিন্ন আলোচনার সংকলন ‘বন্ধন’ নামক গ্রন্থ ‘NAK BANGLA’ সিরিজের প্রথম পরিবেশনা।

একজন বক্তার বক্তৃতাকে লিখিতরূপে প্রকাশ করার কাজটা সত্যিই অনেক কঠিন ও চ্যালেঞ্জের। তরুণ অনুবাদক মাসুদ শরীফ ভাই বক্তব্যগুলোর সাহিত্যিক মান নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। বক্তব্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় চলে আসে। আমরা সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে প্রাসঙ্গিকতা রক্ষার চেষ্টা করেছি। তরুণ আলেম আব্দুল্লাহ আল মাসুদ ভাই বইটির শারঙ্গ সম্পাদনা করে দিয়ে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আমি ‘ন্যাক বাংলা টিম’-কে বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই। দিনের পেরেশানি থেকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমে তারা দুর্দান্ত কাজ করছেন। এই বইকে ছাপার অঙ্করে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে অনেকেই পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। প্রত্যাশিত পারিবারিক বন্ধন গড়তে বইটি দারুণ ফলপ্রসূ হবে বলে আমার বিশ্বাস। বারাকাল্লাহ ফীহি।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

আমাদের কথা

পরিবার একটি রাষ্ট্রের কিংবা সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক। পরিবারের ভিত্তি যত দৃঢ় হবে, আমাদের সমাজও তত বেশি শক্তিশালী হবে। কিন্তু এই ভিত্তি দুর্বল হলে গোটা সমাজ পতনের গহবররপানে ছুটতে থাকে। মানুষের সঙ্গে গড়ে ওঠা নানান সম্পর্কের মাঝে সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে কাছের হলো পারিবারিক বন্ধন। আর এই বন্ধনে আবদ্ধ সকল মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি পরিবারের সদস্য হিসেবে আল কুরআন ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য ও অধিকারের সীমারেখা ঐকে দিয়েছেন।

ইসলামের আত্মিক শান্তি ও সামাজিক শীতলতা যদি এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তবে শুরুতেই ইসলামকে আমাদের পরিবারে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইসলামের বাণী পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে তখন, যখন প্রত্যেক মুসলিম সন্তান বড় হবে ইসলামকে তার হৃদয়ে ধারণ করে। পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে তখনই, যখন পরিবারের সদস্যরা অন্যায় থেকে বিরত থাকবে। বাবা-মা তার সন্তানের হক নষ্ট করবে না, আবার সন্তান তার বাবা-মায়ের প্রতি নীতিপরায়ণ হবে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের দুর্বলতার সুযোগ নিবে না; বরং একজন আরেকজনের ঢালস্বরূপ হবে। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম সমাজে ইসলামের দেখিয়ে দেয়া পথ অনুসরণ তো হচ্ছেই না; বরং কুরআনের আয়াত অপব্যবহার করে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছেন, নিজ কর্তব্য পালন না করে কেবল অধিকারের কথা বলছেন, অভিভাবক সন্তানের উপর তাদের অন্যায় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছেন।

মুসলিম পরিবারকে এসব অনাচার থেকে রক্ষা করার তাগিদ থেকেই উস্তাদ নোমান আলী খান পরিবারে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন আয়াতের আলোকে বিভিন্ন সময়ে কিছু বক্তব্য দিয়েছেন; যার সংকলিত রূপ হচ্ছে এই ‘বন্ধন’ বইটি।

যেকোনো পরিবারের যাত্রা শুরু হয় বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে। এই বন্ধন একটি পবিত্র বন্ধন। যার পরতে পরতে রয়েছে বরকতের ছড়াছড়ি। কিন্তু আমাদের সমাজে এই বরকতময় বন্ধনের শুরুটা হয় নানা রকম বরকতহীন কাজের মধ্য দিয়ে। সুন্নাহ পরিপন্থী নানাবিধ কার্যকলাপ ও রসম-রেওয়াজ পালন করার মাধ্যমে।

যার ফলে শেষ পর্যন্ত বরকতময় এই বিবাহ-বন্ধনে আর বরকত থাকে না। এর পরিণতি হলো সংসার জীবনে নানাবিধ ঝগড়া-কলহ আর অশান্তি। ক্ষেত্র বিশেষে ডিভোর্স, ছাড়াছাড়ি।

উল্ভাদ আমাদের সমাজে বর্তমানে বিয়ে নিয়ে যেসব জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং নবিজির সুন্নাহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

নবিজির উম্মতের কাউকে আমরা ছুঁড়ে ফেলে রাখি না। সমাজের কোনো অংশকে অচল রেখে গোটা সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। তাই বিয়ের ক্ষেত্রে তিনি বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্ত নারীদের যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছেন এবং সমাজে তাদেরকে বাঁকা চোখে দেখা ভ্রান্তির কথা তুলে ধরেছেন।

আবার বিয়ে নিয়ে নারীদের মতামতকে গ্রাহ্য না করা, তাদেরকে কাঁধের বোঝা মনে করার মতো ধারণারগুলোরও অপনোদন করেছেন। তাদেরকে সমাজের ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক বিয়ে দেয়াটা অন্যায়। বিয়ে একটি পবিত্র বন্ধন, যেখানে আল্লাহর রহমত থাকে। কিন্তু আমাদের নানান ভুলের কারণেই আমরা এই রহমতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হই। তাই বিয়ের সঠিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের সকলকেই জানতে হবে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সহযোগিতায় বিয়ের সম্পর্ক টিকে থাকে। তাই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মাঝে যথেষ্ট স্বচ্ছতা, বিশ্বাস এবং সম্মান থাকা প্রয়োজন। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা স্বামীকে যেমন মর্যাদা দিয়েছেন, ঠিক তেমনি স্ত্রীর প্রতি তার কর্তব্যও স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। পারস্পরিক দাম্পত্য সম্পর্কের সমস্যা আসে তখনই, যখন আমরা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠি অথচ নিজের কর্তব্যের ব্যাপারে বেখবর থাকি। বিয়ের সম্পর্ককে যখন আমরা নিছক ডেটিং-এর মতো ভাবি। আমরা কেবল উপভোগ্য সময়গুলো কামনা করি আর দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে পালানোর বাহানা খুঁজি।

আবার পুরুষ সমাজের অনধিকার চর্চার প্রতিও উল্ভাদ ইঙ্গিত করেছেন, যেখানে তারা স্ত্রীর উপর নিজেদের সিদ্ধান্ত, নিজেদের কর্তব্য চাপিয়ে দিতে চায়। তারা স্ত্রীকে শশুর-শাশুড়ির চাকর বানিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু শশুর-শাশুড়ির প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য আসলে কতখানি? স্বামী চাইলেই কি গর্ভপাত করতে স্ত্রীকে বাধ্য করতে পারেন? স্ত্রী হিজাব করতে না চাইলে স্বামীর কী করণীয় থাকতে পারে? একজন স্বামী কীভাবে কারও অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে বাবা-মা আর স্ত্রী সবার প্রতি ন্যায়পরায়ণ থাকবে?

সংসারে শান্তি বজায় রাখতে স্বামীর ভূমিকা কী হওয়া উচিত, কুরআনের আলোকে সে সম্পর্কে উস্তাদ আলোচনা করেছেন।

আবার স্ত্রীদের সম্পর্কে বলেছেন, দাম্পত্য জীবন সুখে ভরিয়ে রাখতে তাদের কী করণীয়। স্বামীর আগমনে তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানানোর গুরুত্ব, তার সামনে নিজের সাজসজ্জার প্রতি যত্নবান হওয়া, তার পিতা-মাতার প্রতি সদয় আচরণ করা ইত্যাদি ছোট ছোট কাজ, যা আমরা করতে ভুলে যাই। অথচ এগুলোই হৃদয় জয় করার হাতিয়ার, সাংসারিক সুখের তুচ্ছ অথচ বিরাট বাহন।

স্বামী-স্ত্রী যখন বাবা-মা হন, তখন তাদেরকে নিজেদের সম্পর্কের ব্যাপারে আরও সচেতন হতে হয়। কারণ, তাদের কথা কাটাকাটি, একে অপরের প্রতি বিরূপ আচরণ সন্তানের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। পিতা-মাতার কাছেই সন্তান শিখে ফেলে কীভাবে অপমান কিংবা জোর করে নিজের উদ্দেশ্য সফল করা যায়। সন্তানকে নামায আদায়ের শিক্ষা যেমন পরিবার দিবে, তেমনি তার নৈতিক মূল্যবোধও পরিবার থেকে পাওয়া শিক্ষার ফলেই গড়ে উঠবে।

যদিও সন্তান প্রতিপালনে মা-বাবার কর্তব্য সম্পর্কে আমরা সকলেই কমবেশি জানি। অতীতের সমাজ আর এই সমাজ খুবই ভিন্ন। বর্তমান সমাজে লোভ-লালসা, অশ্লীলতার ছড়াছড়ি সর্বত্র। এই সমাজে বিশেষত; পশ্চিমা বিশ্বে সন্তানের ইমান যদি মজবুত করে গড়ে তোলা না হয়, তাহলে ধর্মান্তরিত হতে দ্বিধাবোধ করবে না। আর আমরা আমাদের সন্তান পালনে ব্যর্থ হলে উত্তরাধিকার সূত্রে এই ব্যর্থতা পরবর্তী সকল প্রজন্মকে ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দিবে। তাই সন্তান কার সাথে কথা বলছে, কার সাথে মিশছে, এগুলো জানার জন্য বাবা-মাকে সন্তানের উত্তম বন্ধু হতে হবে। তার মনের কথা জানতে হবে, তাকে বুঝতে হবে। নিজেদের ব্যস্ততার বাহানা বানিয়ে আমরা সন্তানকে দূরে ঠেলে দিই, বিভিন্ন গ্যাজেট তার হাতে ধরিয়ে দিই। শিশু বয়সে সন্তানের সাথে দূরত্ব তৈরি হয়ে গেলে পরবর্তীকালে তা কী ভয়ানক পরিণতি আনতে পারে, তার উদাহরণ সমাজে অগণিত।

সন্তানকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে, নামায আদায়ের প্রতি মনোযোগী হতে শিশুকাল থেকেই চেষ্টা করে যেতে হবে। কিন্তু সেই চেষ্টা বকাঝকা আর মারধর করে নয়। তাদেরকে ইসলামের কাছে টানার বিভিন্ন কৌশল নিয়েই উস্তাদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আগামী প্রজন্মকে পতনের হাত থেকে রক্ষার্থে আমাদের কুরআনের কাছেই ফিরে যেতে হবে।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসূলদের সন্তান পালনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। ইবরাহিম (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা যখন মানবজাতির ইমাম ঘোষণা করেছিলেন, তখন তাঁর প্রথম দোয়া ছিল পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে। কারণ, যদি প্রজন্মান্তরে ইসলামের জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে পারি, তবেই আমরা ইসলাম প্রচারে সফল হব, নয়তো ইমাম হিসেবে আমরা ব্যর্থ। কুরআনে উল্লেখ আছে ইয়াকুব (আ.)-এর কথা, কীভাবে তিনি শিশু ইউসুফের স্বপ্নকে উৎসাহিত করেছিলেন, তাকে আরও বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। কুরআন দেখিয়েছে নবির সন্তানেরাও নিজেদের ভাই-বোনের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে। নবির সন্তানেরাও পথভ্রষ্ট হতে পারে। তাই আমরাও এধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারি, যা হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে আসেনি বরং আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করেছেন। সন্তান লালন-পালনে আমাদের আল্লাহর দেখানো পথে চলার পাশাপাশি আল্লাহর উপর আস্থা রাখা এবং সন্তানের মঙ্গলের জন্য, তাকে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আল্লাহর কাছে সবসময় দোয়া করার গুরুত্ব অপরিসীম।

নিঃসন্দেহে সন্তান লালন-পালনের গুরুদায়িত্ব যাদের উপর অর্পিত হয়েছে, সেই বাবা-মা আমাদের সর্বোচ্চ সম্মানের দাবিদার। বাবা-মা আমাদের জন্য তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করেন না, অথচ আমরা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সময়টুকু পর্যন্ত দিই না। আমরা আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করি না। কথা বলার সময় অন্যমনস্ক থাকি, তাদের আবেগ-অনুভূতিকে ছোট করি, অসম্মান করি। তারা আমাদের প্রতি যতটা দয়াপরবশ ছিলেন, আমাদেরও ঠিক ততটাই সহনশীল হতে হবে তাদের প্রতি। কারণ, বাবা-মায়ের দোয়া নিয়ে এবং তাদের সেবা করেই আমরা পৌছতে পারি আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য জান্নাতে। যেখানে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে কেউ নিরাশ হবে না, সকলের জন্যেই থাকবে তার কাজক্ষিত পুরস্কার।

পারিবারিক বন্ধনগুলোর প্রতি আরও যত্নশীল হওয়া কতটা প্রয়োজনীয়, তা যদি উপলব্ধি করা যায়, তবেই এই বইয়ের উদ্দেশ্য সফল হবে। নিজেদের মধ্যে অহরহ যেসব ঝগড়া-বিবাদ হয়, সেগুলো কৌশলী উপায়ে কীভাবে এড়িয়ে চলা যায়, কীভাবে আমাদের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করা যায়, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করা যায়, তার কিছু নমুনা পাওয়া যাবে এই ‘বন্ধন’-এর গাঁথুনিতে।

বিনীত

এন. এ. কে বাংলা টিম

সূচিপত্র

১. বাবা ও কাকের গল্প	১৩
২. সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য	১৭
৩. সবার আগে পরিবার	২৩
৪. সন্তান প্রতিপালন	২৯
৫. জোর করে বিয়ে	৩৪
৬. গর্ভপাত	৩৭
৭. বিয়ে : পছন্দ-অপছন্দ ও চাপানো	৪১
৮. পতনপূর্ব অহংকার	৪৪
৯. মা-বাবার সাথে	৪৯
১০. বিধবা বিয়ে: ভুলে যাওয়া সুন্নাহ	৫৫
১১. কীভাবে সন্তানদের নামাযের জন্য উৎসাহিত করবেন	৫৮
১২. স্ত্রী এবং শ্বশুর-শ্বাশুড়ি	৬০
১৩. আপনার সন্তানকে সময় দিন	৬৪
১৪. পুরুষেরা জান্নাতে হ্র পাবে, নারীরা কী পাবে	৬৬
১৫. ইসলামে স্ত্রীর অধিকার	৭২
১৬. বিয়ে আর ডেটিং কি এক	৭৭
১৭. আমার স্ত্রী হিজাব করেছে না, কী করব	৮২
১৮. সন্তানকে কীভাবে ইসলামের শিক্ষা দেবেন	৮৪
১৯. সন্তানহীনতা কি আল্লাহর শাস্তি	৯৫
২০. অর্ধাঙ্গীনি না কষ্টাঙ্গীনি	৯৮
২১. ব্যর্থ প্রজন্মের লক্ষণ	১০০
২২. সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের গুরুত্ব	১০৫
২৩. আমার সবচেয়ে প্রিয় দোয়া	১১১
২৪. দেশি বিয়ে	১১৫
২৫. ইবরাহিম (আ.)-এর সন্তান ভাবনা	১১৭
২৬. উস্তাদ নোমান আলী খান-এর জীবনী	১৩১
২৭. পরিশিষ্ট : শরঈ সম্পাদকের কথা	১৩৭
২৮. পরিশিষ্ট : নোমান আলী খানের কাজসমূহ যেখানে পাবেন	১৪০
২৯. পরিশিষ্ট : বায়্যিনাহ টিভি কী	১৪১

বাবা ও কাকের গল্প

এক

আমার শিক্ষক একবার একটি গল্প বলেছিলেন।

এক লোক তার ছেলেকে নিয়ে পার্কে হাঁটছিলেন। ছেলেটির বয়স ছিল দুবছর। সে গাছের উপর একটি পাখি দেখে বলল, ‘বাবা এটা কী?’

‘এটা একটা কাক।’ বাবা উত্তর দিল।

‘বাবা এটা কী?’ আবার প্রশ্ন।

‘কাক বাবা।’ বাবার আবার উত্তর।

‘আচ্ছা ঠিক আছে। বাবা এটা কী?’ একটু হেঁটে আবার প্রশ্ন।

‘এটাও একটা কাক।’ বাবা হেসে উত্তর করল।

‘ও কা...ক। আর ওটা?’ আবার প্রশ্ন।

‘ওটাও কাক।’ বাবার উত্তর।

এভাবে দশ মিনিট ছেলেটি বাবাকে একই প্রশ্ন করে গেল। বাবা ৩০ বার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বাড়িতে ফিরে তিনি ছোট একটা ডায়েরিতে পুরো ঘটনাটা লিখে রাখলেন, ‘আমার ছেলে আজ পার্কে হাঁটার সময় একটি কাককে নিয়ে ৩০ বার প্রশ্ন করেছে। অসম্ভব সুন্দর এক স্মৃতি।’

ত্রিশ বছর পর...

ছেলের বয়স এখন ২ বছর না, বত্রিশ বছর। বাবা ছেলেকে ফোন করল, ‘আমি কি তোমার কাছে আসতে পারি?’

‘বাবা, এটা ঠিক দেখা করার সময় না।’ ছেলে ফোনের ওপার থেকে বলল।

‘আমাকে কিছুক্ষণ সময় দাও। আমার মাত্র দশ থেকে পনেরো মিনিট দরকার। শুধু এইটুকু সময় হলেই চলবে। একবার এসো পুজ। তোমার সাথে গাড়িতে করে বের হব। তোমার সাথে কিছু ব্যাপারে কথা বলার আছে।’ বাবা বলল।

‘আহ! ঠিক আছে।’ একরাশ বিরক্ত নিয়ে ছেলে ফোন রাখল।

বাবা এসে গাড়িতে উঠে ছেলেকে নিয়ে একটি পার্কে গেলেন। ছেলে মহা বিরক্ত হয়ে বলল, ‘এসব কী বাবা? কী বলতে চান, তাড়াতাড়ি বলুন। আমার কাজ আছে।’

‘আমার সাথে একটু হাঁটবে পুজ?’ বাবার কণ্ঠে করুণ আকুতি।

হাঁটতে হাঁটতে বাবাটি এক গাছের ডালে একটি কাক দেখতে পেলেন। বাবা বললেন, ‘বাবা এটা কী?’

‘বাবা তুমি কি সত্যিই জানতে চাও? এটা একটা কাক।’ ছেলে উত্তর দিল।

‘ও! আচ্ছা। এটা কী?’ বাবা আবার প্রশ্ন করল।

ছেলে চোখমুখ কটমট করে বলল, ‘এটা কি একটা খেলা? আমার কাজ আছে। ঠিক আছে। এটা একটা কাক। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না? আমি গত মাসে আপনাকে নতুন চশমা এনে দিয়েছি। আমার সাথে তবে এরকম হচ্ছে কেন? বাবা, আপনি কেন এত জটিল প্রকৃতির, তা আমি বুঝতে পারছি না? সমস্যাটা কোথায়? জাস্ট বলুন, কী চান। আমি ব্যস্ত, ঠিক আছে?’

বাবা তার ডায়েরির পাতা খুলে বললেন, 'ঠিক এরকম একটা ঘটনা ত্রিশ বছর আগে ঘটেছিল। আমরা সেদিন এই পার্কে হাঁটছিলাম। তুমি একটি কাক দেখেছিলে। সেদিন তুমি ত্রিশবার আমাকে এই কাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলে এবং প্রতিবার আমি হেসে উত্তর দিয়েছিলাম। আর এখন তুমি দ্বিতীয়বারও উত্তর দিতে পারছ না!'

দুই

আপনারা নিজেরাই চিন্তা করুন। বাবা-মা আমাদের জন্য কী করেছেন, আর আমরা এখন তাদের জন্য কী করছি।

এমন অনেক পিতা-মাতা আছেন, যখন তাদের সন্তান হাসপাতালে ইনকিউবেটরে থাকে, তারা ছোট্ট গ্লাসের বাক্সের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা হাসপাতালে শুধু দাঁড়িয়েই থাকেন। কখনো বসেন না। ভেড়িং মেশিনের খাবার দিয়েই তাদের জীবন চলছে। আর ঠিক এই সন্তানই বড় হলে, ফোন করে খবর নেয়ারও সময় হয় না। কত মা তার সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করতে গিয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যায়। আর এখন তার ফোনের উত্তর দেয়াও অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। এখন তাঁকে কী দিচ্ছেন? সারা দিনে দুই মিনিটের মতো সময়! তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা অন্তত ভাবার বোধ তাকে দিন।

একটা সময় আপনি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন, আর এখন তিনিই আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বহীন। এটা কতটা ন্যায্য বিচার? তারা মনে মনে প্রতিদিন এই যন্ত্রণা বয়ে বেড়ায়, আমি আমার সন্তানের কাছে কিছুই না। আমি তাদের কাছে কিছুই না। আমি তাদের কাছে মূল্যহীন। আমার জন্য তাদের হাতে কোনো সময় নেই।

যার কদর করি, আমরা তাকেই সময় দিই। আপনি বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সময় কাটান। নিজের মতো করে থাকেন। মা-বাবাকে সময় দেন না। এই বদ অভ্যাসটা আপনিই বাড়তে দিয়েছেন। আর সময়ের সাথে সাথে তা শুধু আরও খারাপ হয়েছে।

আমাদের পিতা-মাতা অনেক অনেক বেশি আবেগ প্রবণ। তারা অনেক কিছুই চেপে রাখেন। নিজে বাবা-মা না হলে এটা বুঝতে পারবেন না। আপনার বয়স ষাট হলেও আপনি তাদের কাছে শিশু। তারা এখনো মনে করতে পারে,

আপনার ময়লা ন্যাপি পরিষ্কার করার কথা। আপনাকে দুধ খাওয়ানোর কথা, কীভাবে ঢেকুর তুলেছেন, পেছনের সিটে বসানোর পর কীভাবে আপনাকে পরিষ্কার করেছে, খাইয়েছে, আরও কত কী। আপনার কিছুই মনে নেই। তাদের আছে। আমার সন্তানও এটি মনে রাখবে না।

গাড়িতে চলতে চলতে বাচ্চারা বলে উঠবে, আক্সু আক্সু টয়লেটে যাব, টয়লেটে যাব। বলতে বলতেই হয়তো... এই বাচ্চাই একদিন যখন গ্রাজুয়েশন করে বিয়েটা করবে, তখন আর এটা মনে রাখবে না। কিন্তু আমি কখনো ভুলে যাব না। আমি ভুলব না, তাকে কীভাবে বাথরুমে নিয়েছি, তাকে পরিষ্কার করেছি, জামা পরিয়েছি।

সে বলেছিল আক্সা, এই স্পাইডারম্যান পোশাকটি পরিয়ে দিন। আমার সন্তান এর কিছুই মনে রাখবে না। আমি রাখব। আমি মনে রাখব। এই একই শিশু যখন পিতাকে একদিন বলে, 'বাবা আমি ঠিক তোমাকে বুঝি না, আমার হাতে একদম সময় নেই'। এটা আসলেই তাকে দুঃখ দেয়। এটা আসলেই তাকে দুঃখ দেয়। ঠিক এ আচরণটাই আমি-আপনি আমাদের মাতা-পিতার সাথে করি। তারা ছিল আমাদের লাইফ সাপোর্ট। আমাদের জন্য তারা তাদের জীবন দিয়েছেন, তাদের ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়েছেন, তাদের ছুটি এবং বন্ধুদের সঙ্গে ত্যাগ করেছেন। আপনি জানেন সেটা? আমি এটা এখন জানি। তখন আমি তা জানতাম না। আপনি আসার আগ পর্যন্ত তাদের জীবনের এক ধরনের পরিকল্পনা ছিল। আর আপনি আসার পর আপনিই হয়েছেন তাদের পরিকল্পনা। আপনিই তাদের সবকিছু। এখন একটা কিছু আপনার মন মতো না হলেই আপনি রেগে যান। আপনি কিছুই গুনতে চান না। তাদের সাথে চিৎকার করে কথা বলেন।

তারা আপনার জন্য কী করেছে আর আপনি তাদেরকে কী ফিরিয়ে দিচ্ছেন! এটা খুবই অন্যায়। খুবই অসমীচীন। 'আমার বাবা এত বিরক্তিকর, আমার মা এই, তারা সবসময় রাগী, তারা কখনো সুখী নয়, তারা এই, তারা সেই...'

কিন্তু আপনি কী? আপনার অবস্থা কী? আমি আপনাদেরকে বলছি। আমি সবসময় এটা বলার সুযোগ পাই না। যদি আপনি আপনার মা-বাবার দোয়া না পান, আপনার জীবনের কোনো কিছুই ভালো হবে না। আমি আবারও বলছি, আপনার জীবনের কোনো কিছুই ভালো হবে না।

তাদের সুখী করার জন্য আপনাকেই সব করতে হবে।

সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

‘তার নিদর্শনাবলীর মাঝে আরেকটি হলো: তোমাদের জন্য স্ত্রীদেরকে তোমাদের থেকেই সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের মাঝে তোমরা শান্তি খুঁজে পাও। এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মাঝে তৈরি করেছেন সম্প্রীতি ও দয়া। চিন্তাশীল লোকদের জন্য অবশ্যই এর মাঝে নিদর্শন আছে।’ সূরা আর-রুম : ২১

কুরআনের সবগুলো আয়াতই সুন্দর। তবে এটা যেন এক কাঠি বেশিই সুন্দর।
বিবাহিতরা এই আয়াতের প্রয়োগ খুব বেশি করে খুঁজে পাবেন।

আল্লাহ তায়ালা বললেন, তিনি আপনাদের মধ্যে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে
‘মাওয়াদ্দা’ তথা প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং ‘ওয়া রাহমা’ তথা দয়া-মায়া দান
করেছেন। কারণ, বিয়ের প্রথম দিকে ভালোবাসা প্রগাঢ় থাকে। আপনি আপনার
স্ত্রীকে নিয়ে মুগ্ধ থাকেন। তখন আপনি অন্য কিছুই কথা আর চিন্তা করতে পারেন
না। আপনার বন্ধুরা যখন আপনাকে কল দেয়, তারা সরাসরি ভয়েস মেইল-এ
যায়। আপনি সদ্য বিবাহিত। ছ মাস ধরে আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

বিয়ের বয়স যত বাড়ে, আপনাদের বিবাহিত জীবন তখন কিসে চাঙা রাখে? এটা কি আগের মতো থাকে? না, বরং তখন অন্যান্য দায়িত্ব নিতে হয়, বাচ্চা হয়। কাজের ব্যস্ততার কারণে সম্পর্ক আর মধুর থাকে না। তাহলে কীভাবে আপনার দাম্পত্য জীবন বজায় রাখবেন? দুজনের প্রতি দুজনার অনুগ্রহ থাকতে হবে। একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

একবার উমর (রা.)-এর কাছে এক লোক এল। সে বলল, 'আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই'।

তিনি বললেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাও কেন?'

কারণ, তাকে আর আকর্ষিত মনে হয় না, তাই আমি আর তাকে ভালোবাসি না। ওমর (রা.) বললেন, সৌজন্যতার কী অবস্থা তোমার? স্ত্রীর প্রতি উদারতার কী হলো? সে কি তোমার সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করছে না? সে কি তোমার দেখভাল করছে না?

কোনো কিছু দেখাশোনার বেলায় আমরা পুরুষরা খুবই কঠিন প্রাণী। আমাদের স্ত্রীরা সবসময়ই আমাদের দেখাশোনা করে। যদিও তারা মাঝে মাঝে কিছু কথা শোনায় কিন্তু দিন শেষে তারাই আমাদের দেখাশোনা করে। ঠিক তাই স্ত্রীদের যখন আমাদের কাছে আর খুব ভালো না লাগে, তখন আমরা এটা বলতে পারি না যে, সে তো আর আগের মতো নেই।

আগে যখন আমি আমার দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতাম না এবং প্রচুর টিভি দেখতাম, তাই টিভির মেয়েদের মতো কিছু আশা করছিলাম। যদি এমনটা হয়ে থাকে তবে এটা কোনোভাবেই সুস্থ আচরণ হতে পারে না। যদি বিশ্বাসীরা তাদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে, কুকর্মে প্ররোচনা নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের স্ত্রীদের সাথে যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করে, তাহলে তারা সবচেয়ে বেশি পরিতৃপ্ত হবে। আর তারা বাইরের কোনো প্ররোচনায় লিপ্ত হবে না।

সাথে সাথে বোনদেরকেও এটা বুঝতে হবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পুরুষ এবং নারীদেরকে আলাদাভাবে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষদের বড় দুর্বলতা হচ্ছে নারী। তারা ধনী হতে পারে, গরীব হতে পারে, স্বাস্থ্যবান হতে পারে, হতে পারে হাড়িসার, মোটা অথবা লম্বা, যেকোনো সংস্কৃতি বা ভাষাভাষী হোক না কেন, সবার ভেতরে একই ধরনের দুর্বলতা কাজ করে।

আর তা হলো নারীদের প্রতি দুর্বলতা। আল্লাহ তায়ালা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষদের এই দুর্বলতার ব্যাপারে নারীদেরকে অন্যমনস্ক করেছেন। তারা বুঝতে পারে না, এটা কত নিকৃষ্ট। কাজেই যখন মহিলারা দৃষ্টি নত রাখার আয়াতটি পড়ে, তখন তারা অনায়াসেই বলে, ‘ও এটা আমি সহজেই করতে পারব’। আর তারা বুঝতে পারে না, পুরুষরা কেন সহজে তাদের দৃষ্টি নত রাখতে পারে না! তারা বলে, ‘আমি বুঝি না! তোমারও চোখ আছে, আমারও আছে, তাদেরও রেটিনা আছে, কাজেই সমস্যাটা কোথায়?’ তারা ঠিক ধরতে পারে না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের ভেতরে যে আকুল আকাঙ্ক্ষার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং এক নম্বর আকাঙ্ক্ষা হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা হলো, ‘মানুষের কাছে সুশোভিত করা হয়েছে নারী।’ সূরা আলে-ইমরান : ১৪

প্রবৃত্তির মধ্যে প্রথম এটা। পুরুষদের জন্য অলঙ্কৃত করা হয়েছে নারীদের কামনাকে। নারীদের ব্যাপারে নবিজি ﷺ এক নম্বর ফিতনা হিসেবে তাঁর উম্মতদের ব্যাপারে ভয় করেছেন। কারণ, এটি একটি জটিল সমস্যা। স্ত্রীরা এটি বুঝলে স্বামীদেরকে নিন্দা করার বদলে তারা গ্রহণ করে নিবে যে, এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বামীদেরকে ‘লাইনে’ রাখতে স্ত্রী চমৎকার ভূমিকা পালন করতে পারেন। তারা বকুনি না দিয়ে বাইরে স্বামীদের কুকর্মে প্ররোচনা দমন করতে পারেন। স্বামী অফিসে যায় অথবা ট্রেনে যায়। ওসব জায়গায় কিছু মেয়ে থাকে যাদের জামাকাপড় অপ্রীতিকর। এরা এভাবেই নিজেদেরকে সম্মানিত মনে করে। তারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তির জন্যে সম্মানিত হন না, তাদের মতামতের জন্যে সম্মানিত হন না। তারা মনে করেন, যদি পুরুষরা আমাদের শরীর বেশি দেখে, তাহলে আমরা বেশি সম্মানিত হবো! তাই তারা অশ্লীল জামা-কাপড় পরে ফ্যাশন করে। যখন কোনো পুরুষ তাদের দেখে, তারা এক ধরনের আত্মমর্যাদা অনুভব করে যে, আমার মূল্য অনেক। মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। এটা ভয়ঙ্কর ও দুঃখজনক।

যখন আপনি অফিসে যান, আপনার সেক্রেটারি আপনার দিকে তাকিয়ে হাসি দেয়। আপনি জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছেন আপনি? দিনটি কেমন কাটছে? দুপুরে লাঞ্চ কী খাচ্ছেন? অথবা আপনি কি রোজা? ও, খুব ভালো।

তারা আপনার দিকে তাকিয়ে হাসি দেয়। ঠিক বিজ্ঞাপনের নারীদের মতো। কাজ শেষে আপনি বাড়ি যান। দরজা খুলেই স্ত্রী জেরা শুরু করে!

‘কোথায় ছিলে?’

‘বাস দেরি করেছে!’

‘প্রতিদিনই কি বাস দেরি করে?’ ‘ও বুঝতে পেরেছি!’

এভাবে প্রতিদিনই এরকম দ্রুত চলতে থাকে। প্রথম দিন এটা ঠিক আছে, দ্বিতীয় দিনও ঠিক আছে কিন্তু এরকম দশ বছর, বারো বছর চলতে থাকলে কী হবে?

মুখে হয়তো বলছে না, কিন্তু স্ত্রীর উপর স্বামীর বিরক্তিভাব চলে আসে। তার ভেতরে খিটখিটে ভাব তৈরি হতে থাকে। ইসলাম এ ব্যাপারে সহজ সমাধান দিয়েছে। যখন স্বামী ঘরে ঢুকে, তখন যেন স্ত্রী তার দিকে তাকিয়ে হাসি দেয়। এটা অনেক বিশাল কিছু। অবহেলা করার ব্যাপার না।

স্বামী ঘরে ঢুকল, কিন্তু স্ত্রী তার প্রতি কোনো খেয়ালই করল না! স্বামীর জন্য এ যেন ছুরিকাঘাতের মতো। স্বামী খুবই বিস্ময়গ্রস্ত হয়, সে হয়তো মুখে কিছুই বলে না। কিন্তু এটা সত্যি সত্যিই স্বামীদেরকে অনেক কষ্ট দেয়। সম্পর্কের ক্ষতি করে। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা নিয়ে আসে। তারা বিপর্যস্ত হয়ে রাতের খাবার খেতে বসে বলে, ঠিকমতো লবণ হয়নি। কী যেন ঠিকমতো হয়নি! সন্তানদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত রাগ দেখাচ্ছে। তারা হতাশ।

কিন্তু একই পরিস্থিতিতে যদি স্ত্রী দরজা খুলে তার স্বামীকে শুধু একটু হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়, শুধু একটু হাসি, এটা দামি কিছু না! তাতে কী হবে? বাকি রাত খুব সুন্দরভাবে পার হবে। স্বামী খুব ফুরফুরে মেজাজে থাকবে। সুন্দরভাবে স্ত্রীর সাথে কথা বলবে। সে এটা বলবে না, ‘আমি এখন কথা বলতে পারব না! আমার মাথা ধরেছে!’ সে কি এটা বলবে? কোথা থেকে এই ভালো কিছু শুরু হয়? শুধু স্ত্রীর ছোট্ট একটা কাজ, একটু হাসি। এগুলো সহজ সমাধান কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর সমাধান।

যদি আপনি এই সমাধানগুলোর প্রতি যত্নবান না হন, এক সময় ক্ষোভ জমা হতে হতে আপনি ঐ অবস্থায় চলে যান, যখন স্বামী আর স্ত্রীর দিকে তাকিয়েও দেখে না। তাকে শুধুই বিরক্তিকর মনে হয়। সে শুধুই এরকম, ওরকম। কাজেই দুজনকেই বুঝতে হবে যে, তাদেরকে একে অপরের প্রতি যত্নবান হতে হবে। অপরজনের কাছ থেকে শুধু আশা করে যাবেন না। তাদের জন্যও আপনি কিছু করুন, যত্নবান হোন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করি না যে, মুসলিম পরিবারগুলো যথেষ্ট পরিণত। সাধারণত, তারা ইসলামিক বাণীগুলোকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। স্বামী হয়তো বলে, ‘তুমি জানো, যারা রাতের বেলা স্বামীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য করে না, মহানবি ﷺ ঐ স্ত্রীদের সম্পর্কে কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, ... তোমার নিজের প্রতি লজ্জা হওয়া উচিত।’ আপনি কি মনে করেন, সে এখন সত্যিই আপনার চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখবে? এটা কোনো প্রতিযোগিতা নয়! স্বামী হয়তো বলে, তোমার সাহাবিদের মতো হওয়া উচিত। তখন স্ত্রীও বলবে, তুমি নিজেও তো সাহাবি নও! এরকম পরিস্থিতি হতে পারে! তাই আপনি যদি এটি নিয়ে প্রতিযোগিতা তৈরি করেন, আপনি নারীদের কখনো হারাতে পারবেন না। আপনার মা, বোন, স্ত্রী কাউকেই যুক্তিতর্কে হারাতে পারবেন না। কারণ, তারা এমন কিছু আপনার সামনে নিয়ে আসবে যা আপনি চিন্তাই করতে পারেন না! আল্লাহ তাদের মধ্যে এটি দিয়েছেন। তাদের কথা বলার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, মনস্তাত্ত্বিক কথা, যুক্তিতে কার্যকর বক্তব্য। কাজেই আপনাকে এসব পরিচালনা করতে শিখতে হবে।

স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্কের জন্য আরেকটি উপদেশ হচ্ছে, যুক্তিপ্ৰদর্শন। পুরুষরা মনে করে, সবকিছুই যুক্তিপ্ৰদর্শন এবং যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে সমাধান করা যায়। ঠিক? তারা ভুলে যান যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নারীদেরকে সহজ সাদা-সিধে ফ্যাশনে তৈরি করেননি। নারীরা জটিল সৃষ্টি। যখন আপনি বিয়ে করেন, আপনি হয়তো কোনো একদিন দেখবেন আপনার স্ত্রী কাঁদছে। আপনি তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কাঁদছ কেন? সে বলবে, ‘আমি জানি না। আমি তোমার সাথে পরে এটি নিয়ে কথা বলব’। মাঝে মাঝে তারা আসলেই কিছু জানে না। আর যদি তারা সেটা জানেও, তাহলে আপনার জন্যে সেটা বোঝা অত্যন্ত জটিল হবে। তাই তারা বলে, ‘তুমি বুঝবে না’! ঠিক বলেছি কি?

আপনি তাদেরকে যুক্তি দেখাবেন, তাদেরকে কারণ দেখাবেন যে, যে কাজের জন্য তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে, সে কাজটি কেন করেছেন। তারা বলবে— ঠিক আছে! তাহলে তুমি আমার চেয়ে বেশি বোঝ। পরের বার আমি তোমার সাথে তর্ক করব না। কারণ, তুমি খুবই যুক্তিবাদী, ঠিক? তাদের অনুভূতিতে আঘাত পাবে। যুক্তিতর্কে কে হারল? আপনি হেরেছেন। কেননা, আপনি তাদেরকে কারণ দেখিয়েছেন। আপনার স্ত্রী, আপনার মায়ের কাছে কোনো বিষয় তুলে ধরার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, আমাদের মহানবি ﷺ-এর সুন্নাহ। এক. অনুগ্রহ। দুই. নীরবতা।

একজন বিশ্বাসী ভালো স্ত্রীর জন্যে নীরবতা অসম্ভব কার্যকর! যদি স্বামী নীরব থাকে, সে জিজ্ঞেস করবে, কী ব্যাপার আমি কি কিছু করেছি? আর যদি স্বামী কিছু বলে, তাহলে আপনার চেয়ে আপনার স্ত্রী অনেক ভালো বলতে পারেন। সে আরও ভালো ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আসবে, যেটা আপনি হয়তো কল্পনাও করতে পারেননি। পক্ষান্তরে, আপনি যদি নীরব থাকেন, আর যদি এক আউস পরিমাণ ভালো কিছু তার মধ্যে থেকে থাকে, সে আপনার কাছে আসবে। বলবে, যদিও আমি মনে করি এটা আমার দোষ না, তারপরেও বলছি এটা আমার দোষ। আমি দুঃখিত।

কিন্তু স্বামীকে এই নীরব থাকার কৌশল শিখতে হবে। ভ্রুকুটিপূর্ণ নীরবতা নয়, যেটা আপনার স্ত্রীকে দূরে ঠেলে দেয়। শুধু একটু বেশি দুঃখভারাক্রান্ত নিস্পাপ চাহনি, এখানে সেখানে। এভাবে দেখুন আপনার মায়ের সাথে কাজ হচ্ছে কিনা। তারপর ইনশাআল্লাহ আপনার স্ত্রীর সাথেও কাজ করবে।

রাসূল ﷺ উনার স্ত্রীদের সাথে চিৎকার চোঁচামেচি করতে পারতেন। তিনি কঠোর কথা বলতে পারতেন। কিন্তু তিনি বলেননি। কারণ, এই সম্পর্কগুলো এত নাজুক যে, শয়তান এই সম্পর্কগুলো নষ্ট করে দেয়ার জন্য প্রত্যেকটি সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। যখনই শয়তান এই সম্পর্কগুলো ভেঙে দিতে সমর্থ্য হয়, তখনই মুসলিম সমাজে অধঃপতন শুরু হয়। পুরুষরা আর তাদের দৃষ্টি নত রাখে না। একের পর এক অন্যান্য খারাপ জিনিস হতে থাকে। স্ব্যাভাল বিস্তার করতে থাকে। খারাপ দাম্পত্য জীবন থেকে এগুলো এভাবেই বিস্তার লাভ করে। মুসলিম সমাজে যত বড় বড় দুঃখজনক ঘটনা ঘটে, যেগুলো নিয়ে মানুষ কথা বলতে চায় না। কারণ, সেগুলো শুনতে ন্যাকারজনক। এগুলো কোথা থেকে শুরু হয়? সেগুলো স্বামী স্ত্রীর খেয়াল রাখে না, আর স্ত্রী স্বামীর খেয়াল রাখে না, এখান থেকেই শুরু হয়।

তাই একজন বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের হৃদয় এবং আমাদের ইমানকে দৃঢ় করতে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ স্বামী, শ্রেষ্ঠ স্ত্রী বানিয়ে দিন।

সবার আগে পরিবার

নবিজি ﷺ-কে সূরা আশ শু'আরার শেষে বলা হয়েছিল—

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ . وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
'(ও মুহাম্মদ ﷺ) আপনার সবচেয়ে কাছের পরিবারের সদস্যদের সতর্ক
করে দিন। এবং মুমিনদের মধ্য হতে যারা আপনার অনুসরণ করে
তাদের প্রতি সদয় হোন।' সূরা শু'আরা : ২১৫

মহানবি ﷺ-এর পরিবারের জন্যে অনেক উদ্বিগ্ন এবং অগ্রাধিকার ছিল। আর তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করতেন, যাতে করে তারা ইসলামের বার্তা ঠিকমতো পান। এখন, পরিবারে ইসলামের বার্তা পৌছানোর কথা বলার আগে, আমাদেরকে পরিবারের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্কের কথা বলতে হবে। অনেক সময়, আমাদের পরিবারের মধ্যে যোগাযোগের অবস্থা খুবই খারাপ থাকে। আমরা ভালো শ্রোতা নই। তাদের অবস্থান থেকে তাদের কথা বুঝার মতো সংবেদনশীলতা আমাদের থাকে না। এটা স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে ঘটতে পারে, পিতা-মাতা সন্তানের মধ্যে, সন্তানদের মধ্যেও হতে পারে। অনেক সময় আমরা একে অপরকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি। কারণ, আমরা একটি পরিবার। আমাদের যেভাবেই হোক এটা করতে হয়। কারণ, আমরা একে অপরকে ভালোভাবে চিনি। এত ভালোভাবে চিনি যে, আমরা অনেক সময় একে অপরকে পীড়াদায়ক কথা বলে থাকি এবং আস্তে আস্তে এটাই নিয়ম হয়ে যায়।

তাই যখন কেউ পীড়াদায়ক কথা বলে, তখন আমরাও এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে একই রকম অথবা এর চেয়েও বেশি জঘন্য কথা বলে থাকি। সময়ের সাথে সাথে পরিবারের মানুষদের মধ্যে, এগুলো খুবই কুৎসিত সম্পর্ক তৈরি করে। এমনটা হতে পারে ভাই-বোনদের মাঝে পিতা-মাতা-সন্তানের মাঝে এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। তাই মাঝে মাঝে আমাদের পুনরায় পর্যালোচনা ও চিন্তা করতে হবে যে, আমাদের জীবনে সবচেয়ে অগ্রাধিকার কোনো জিনিসটির এবং আপনি কেমন মানুষ সেটা নির্ভর করবে, আপনার সাথে আপনার পরিবারের সম্পর্ক কেমন। আপনার কাছে মানুষগুলোর সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন, তার উপর নির্ভর করবে। আপনি জানেন, আপনার এবং আমার সাথে আমাদের নিয়োগ কর্তার, বন্ধু ও সমাজের মানুষদের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা পেশাগত কারণে এবং সামাজিক কারণে মানুষদের চিনি। কিন্তু তারা আমাদের সম্পর্কে খুব কমই জানেন। তাই আমাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন, যাদের সাথে আমরা সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করি। তারা আমাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। আর তারা হচ্ছে আমাদের ‘পরিবার’।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে কুৎসিত দিক। এটা আমাদের সবচেয়ে হীনমন্যতা, সবচেয়ে অসংবেদনশীল, সবচেয়ে অবজ্ঞাপূর্ণ এবং সবচেয়ে নিচু দিক। আর তাই যদি এক পা পিছিয়ে যান এবং নিজেকে প্রশ্ন করেন, ‘আমি কী হয়েছি, আমি কেমন ধরনের মানুষ, যে কারণে আমার মায়ের সাথে আমার সুসম্পর্ক নেই! আমার বাবার সাথে আমি স্বাভাবিক কথোপকথন চালাতে পারি না! আমি আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলি না। আর যদিও বলি, শুধু জিজ্ঞেস করি, চাবি কোথায়, মোবাইলটা কোথায়, ওই চিঠিটা কোথায় পাঠিয়েছ, ঠিক এমন ধরনের ভাসাভাসা কথোপকথন।’ আর যখন সে কথা বলে, আপনি হয়তো তার কথাই শুনেন না! আপনি শুধু বলেন, ‘ও, হ্যাঁ, অবশ্যই, আচ্ছা, এসব কথা। যেন অবজ্ঞা করছেন! আর এটা সে জানে। যখন সে সবসময় তার বন্ধুদের সাথে কথা বলে, তখন আপনি আশ্চর্য হন। বলেন, সে আপনার সাথে কখনো কথাই বলে না! এরপর আপনি যখন কথা বলেন, তখন হয়তো সে এর কোনো উত্তর দেয় না। কারণ, সে জানে, আপনি তার কথা শুনছেন না এবং বুঝতেও চেষ্টা করছেন না। আর এটা আস্তে আস্তে দুপক্ষ থেকেই শুরু হয়। স্বামী স্ত্রীর সাথে, স্ত্রী স্বামীর সাথে এরকম করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য, দুজনের মধ্যে কোনো একজনকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। খুব ভালোভাবে চিন্তা করতে হবে যে, আমরা দুজনেই কেমন যেন হয়ে গেছি!

আর এইটা শুধু অধার্মিক লোকদের ক্ষেত্রেই হচ্ছে না, সবার ক্ষেত্রেই হচ্ছে। যখন পরিবারের মাঝে এসব সম্পর্ক বিরাজ করে তখন, আমাদের কাছে ধর্ম কোনো ব্যাপারই না। এটা শুধুই একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা বিশেষ করে পুরুষরা, আমি পুরুষদের সম্পর্কে একটু বলি! আমরা প্রকৃতিগতভাবেই আবেগগুলোকে অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করি। আমাদের পরিবারের মহিলাদের মতো, আমরা প্রকৃতিগতভাবেই সংবেদনশীল নই। আমরা (পুরুষরা) মনে করি, আমরা যা করি তা বাসায় কোনো আবেগপূর্ণ প্রভাব ফেলবে না। আপনি বাসায় যান আর ইউটিউব দেখা শুরু করেন। খবর দেখা শুরু করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকেন অথবা বন্ধু বা অন্য কারও সাথে ফোনে কথা বলেন। আপনি এর মধ্যে কোনো ভুলই খুঁজে পান না! আপনার পরিবার মনে করছে, আপনি তাদের অবজ্ঞা করছেন। আপনি তাদের প্রতি যত্নবান হচ্ছেন না! আপনি শুধু আপনার কাজই করে যাচ্ছেন। আপনি তাদের কোনো সময়ই দেন না! নিজেকে পরিবর্তন করতে হলে, অবশ্যই অন্যের দিকটা ভাবতে হবে। আপনার স্ত্রীর দিক, ছেলে-মেয়ের দিক এবং পিতা-মাতার দিকটা ভাবতে হবে। আপনাকে তাদের অবস্থান থেকে সবকিছু দেখার চেষ্টা করতে হবে, যা প্রকৃতিগতভাবে আসে না এবং যা আমাদের জন্যে সহজ নয়। আর তারপর আপনার পরিবারের কাছে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে এই বলে যে, ‘আমি কিছু একটা ভুল করেছি।’ আমি জানি, আপনি তাদের হাজারটা ভুলের কথা বলতে পারেন। কিন্তু এটি আপনাকেই শুরু করতে হবে কারণ, আপনি বাড়ির কর্তা। আর এই কাজটি অনেক কঠিন। যখন আপনি এসব জিনিস সামনে নিয়ে আসবেন আর বলবেন, ‘দেখ! আমি জানি, আমি তোমাদেরকে এড়িয়ে চলেছি। অবজ্ঞা করেছি। আর এটা করা আমার একদমই উচিত হয়নি। আমি একজন ভালো শ্রোতা হওয়ার চেষ্টা করব।’ এর ফলে, আপনি অনেক সমাদরপূর্ণ কথা এবং উত্তর পাবেন। কারণ, তারা কখনোই আশা করেনি তাদেরকে আপনি এসব কথা বলবেন। আর তারা বলবে, ‘যাক শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছ তাহলে! তোমার কোনো ধারণাই নেই তুমি কত খারাপ’।

যখন আপনি এরকম আত্মরক্ষামূলক হবেন, প্রথম যে জিনিসটা ঘটে, আপনি প্রকৃতিগতভাবেই আত্মরক্ষামূলক হয়ে যাবেন। আর এটাই সে সময়, যে সময় আপনি আত্মরক্ষামূলক হওয়ার জন্যে অনুমোদিত নন। আর এটাই আপনি সবসময় করে আসছেন। আত্মরক্ষামূলক হবেন না। শুধু সমস্যাটা ধরুন এবং তা সমাধান করুন। আপনি চেষ্টা করবেন, তর্ক করা বা জেতা আপনার কাজ নয়।

দিন শেষে উপরের দিকে থাকা আপনার কাজ নয়। আপনার কাজ হচ্ছে একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা। আপনার স্ত্রীর সাথে একটি ভালো বন্ধুত্ব গড়ে তোলা। পিতা-মাতার সাথে একটা সত্যিকারের অর্থবহ সম্পর্ক গড়ে তোলা। ছেলে-মেয়ের সাথে একটা সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলা। এটাই প্রথম কাজ। মাঝে মাঝে আপনি জানেন, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ, যারা ধার্মিকভাবে মনোভাব পরিবর্তনের কারণে বা যারা অন্য ধরনের মানুষ ছিল এবং পরে ধার্মিক হয়েছে। কিন্তু তাদের পরিবার ওইরকম ধার্মিক নয় বলে, তারা তাদের সাথে পীড়াদায়ক কথোপকথন করেছে। তাদের গলার উপর জোরপূর্বক ইসলাম চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। মহানবি ﷺ তাঁর পরিবারকে ইসলামে আনতে পেরেছিলেন। কারণ, তাঁকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই হুকুম করেছিলেন। তাছাড়াও সম্ভব হয়েছিল, কেননা তিনি তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম ছিলেন। তাঁর সাথে পরিবারের সেই সম্পর্ক ছিল, যাতে তিনি তাঁদের গড়তে পারেন এবং সাবধান করতে পারেন। যদি আপনার সাথে পরিবারের এরকম সম্পর্ক না থাকে, যদি পরিবারের সাথে আপনার সুস্থ সম্পর্ক না থাকে তাহলে আপনি যা বলবেন সেটি হতে পারে ইসলামের কোনো বার্তা; তাঁর কোনো ওজনই থাকবে না। আপনি যাই বলবেন, অন্যান্য জিনিসের মতো ইসলামের বার্তাকেও তারা অবহেলা করবে। তাই খুব ভালোভাবে এবং গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, এসব লেকচার, কথা যা কিছু আপনি শুনছেন, উপদেশ নিচ্ছেন, এগুলো কীভাবে আমাকে মানুষ হিসেবে পরিবর্তন করেছে। সেইসাথে আপনাকে পরিবর্তনের সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, কীভাবে আপনি আপনার কাছের সম্পর্কগুলো পরিবর্তন করছেন। আপনি আপনার কাছের মানুষগুলোর প্রতি কতটা সংবেদনশীল। কারণ, আপনি মানুষ হিসেবে কেমন, দিন শেষে এটিই হচ্ছে বেশ ভালো একটি প্রতিফলন এবং খুব ভালো একটি চিহ্ন, আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন! আপনি জানেন, ক্যামেরার সামনে অচেনা লোকদের সাথে কথা বলা সহজ। এটি সহজ কাজ। কঠিন কাজ হচ্ছে, ক্যামেরা বন্ধ থাকলে মানুষের সাথে ভালোভাবে কথা বলা। আপনার উপর, যখন আপনার আশেপাশের মানুষদের কিছু আশা থাকে, আর তাদের প্রতি আপনারও কিছু আশা থাকে তখন আপনাকে তাদের সাথে খুব কাছ থেকে ও ঘনিষ্ঠভাবে লেনদেন করতে হয়।

তাই আমি দোয়া করছি, যাতে আমরা আমাদের কাছের মানুষগুলোর সাথে পারস্পরিক উন্মুক্ত এবং সম্মান নিয়ে কথা বলে, পারস্পরিক সহনীয় ও একে অপরের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলে, একে অপরের প্রশংসা করে এবং সুস্থ, স্বাভাবিক ও সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি।

আমি এই আলোচনায় ওই প্রশংসা করার কথা বলছি না। আমি শুধু বলছি, সুস্থ কথোপকথনের অংশ হচ্ছে, অন্যের কথা ভুল হলে অভিযোগ না করা যা তাঁর অনুভূতিতে আঘাত হানে। অন্যেরা যা ভালো কিছু করেছে তা তুলে ধরা, কেউ একজন সঠিক কিছু করেছে তাঁর প্রশংসা করা। আপনি আসলেই তাঁর কাজটা উপভোগ করেছেন। পছন্দ করেছেন অথবা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছেন। এসব জিনিসের প্রশংসা করলে আপনার পরিবারের নিয়ম ভঙ্গ হবে না। আপনার অনুভূতি কেমন হচ্ছে এটা কেউ জানছে না। তারা জানছে না আপনার অনুভূতি, তাদের অনুভূতি কেমন হচ্ছে এটা আপনিও জানছেন না! আমাদেরকেই কথা বলতে হবে। আমাদের এই অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে পারার মতো মানুষ হতে হবে। পরিশেষে আমি আপনাদেরকে বলি, আমাদের মধ্যে অনেকেই এশিয়ান, আরব, আফ্রিকান পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে এসেছি। যেখানে পরিবার কাঠামোর কিছু আনুষ্ঠানিকতা থাকে। তাই উন্মুক্তভাবে এবং আবেগীয় দিক থেকে নিজেদের প্রকাশ করা খুব কঠিন। কারণ, আমাদের মাঝে এই ধরনের কিছু আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বিরাজ করে। এসব সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনাকে এই প্রাচীর অতিক্রম করতে হবে। সীমা অতিক্রম করতে হবে। আপনাকে উন্মুক্তভাবে যোগাযোগ করতে হবে এবং সম্মানের সাথে সর্বোপরি খোলামেলাভাবে কথোপকথন করতে হবে। কখনোই বা কোনোভাবেই মনে করবেন না যে, অন্যের অনুভূতি কেমন হচ্ছে আপনি তা জানেন! তাদেরকে তাদের মনের আবেগ প্রকাশ করতে দিন। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই এই ধরনের পরিবেশ তৈরি করতে পারব, যাতে আমাদের বাড়িতে সবাই আরামদায়কভাবে কথা বলতে পারে।

আমি ইয়াকুব (আ.)-এর কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, কীভাবে তিনি ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করতে সহজ করে দিয়েছেন, যাতে তিনি তাঁকে তাঁর স্বপ্নের কথাও বলতে পারে। কোন বাচ্চাটি চিন্তা করবে যে, আমার স্বপ্নের কথা আমার বাবাকে বলব। খেলার মাঠে কিছু একটা হয়েছে, যেটা আমি আমার বাবাকে বলব! আসলে আমি আমার বাবাকে বলব না, প্রথমে আমি আমার মাকে বলব। তিনি কী মহৎ বাবা।

তিনি তাঁর বাচ্চাকে এতই অনুভূতি প্রকাশের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন যে, ছেলেটা একটা অপছন্দের স্বপ্ন দেখেছে এবং সে সেই স্বপ্নের কথাও তাঁর বাবাকে বলছে। আর তাঁর বাবা ছেলেকে বলছে, ‘আহ! তুমি কাল রাতে খারাপ খাবার খেয়েছ। এটা নিয়ে উদ্বেগ হয়ো না।’ বাবা তাঁর ছেলেকে আশ্বস্ত করল।

অথবা সে ভালো কোনো মন্তব্য করল যে, এটা অবিশ্বাস্য! তোমার সামনে অনেক সুন্দর একটি ভবিষ্যৎ আছে। একটি স্বপ্ন দেখার পর আপনি কেন আপনার বাচ্চাকে বলবেন, তোমার সামনে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, আল্লাহ যেন তোমাকে সাহায্য করেন। কারণ, একজন সংবেদনশীল বাবা হিসেবে তিনি জানেন, একটা বাচ্চার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, নিশ্চিত হওয়া। তিনি তাঁর ছেলেকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এটি বর্ণনা করেছেন, যাতে আমরা জানতে পারি। আমাদের সংবেদনশীল পরিবারের সদস্য হওয়া উচিত, সংবেদনশীল নেতা হওয়া উচিত। আমাদের ভালো শ্রোতা হওয়া উচিত। সংবেদনশীল মানেই একজন ভালো শ্রোতা। আমাদেরকে ভালো শ্রোতা হতে হবে এবং আমরা যে শুনছি তার চিহ্ন হিসেবে উত্তর দিতে হবে। সবশেষে তিনি তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, তাঁর ভাইদেরকে স্বপ্নের কথা না বলতে। তুমি এটা নিজের কাছেই রাখো। সুবহানাল্লাহ! এটা সত্যিই অনেক সুন্দর। তাই আমাদেরকে এমন মানুষ হওয়া উচিত যাতে, আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসূলদের চরিত্র দেখে শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে আমাদেরকে রহমত দেন। নবিজি ﷺ বলেছেন—

‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তাঁর পরিবারের কাছে সর্বোত্তম এবং তোমাদের মধ্যে আমিই আমার নিজ পরিবারের জন্যে সর্বোত্তম।’

সুনানে তিরমিযী : ৩৮৯৫

তাই আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন, যাতে আমরা আমাদের পারিবারিক জীবনে মহানবি ﷺ-এর অনুকরণ করতে পারি।

সন্তান প্রতিপালন

টিনেজারদের মা-বাবারা প্রায় সময়ই আমার কাছে এসে বলেন, ‘জানেন, আমার ছেলেটা না, আজ-কাল আমার কথা শোনেই না। আপনি ওর সাথে একটু কথা বলবেন?’ তারা এমন ভাবে বলেন, যেন আমি কোনো মহৌষধ সাথে নিয়ে ঘুরি! যেন সেই ছেলেটা আমার কাছে আসলে আমি ওর গায়ে ফুঁ দিয়ে দেব, আর সাথে সাথেই সে দারুণ ভদ্র ছেলে হয়ে যাবে! না, বরং আপনি আপনার ছেলের সাথে কেন কথা বলছেন না? যখন তার সাথে কথা বলার প্রকৃত সময় ছিল তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

আজকে আমি আপনাদের সাথে বাবা-মাদের নিয়ে একটু কথা বলব, তারপর বলব, স্বামী-স্ত্রীদের নিয়ে। খুবই মৌলিক দুটো সম্পর্ক। এটা আপনার সন্তানদের সাথে, আরেকটা আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে। এই দুটো সম্পর্কের ব্যাপারেই আমরা খুব বেসিক কিছু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব।

আপনার সন্তান যখন খুব ছোট, ধরুন, যখন তাদের বয়স পাঁচ, ছয়, সাত কিংবা দুই, তিন, চার। তখন তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন জিনিসটা বলুন তো? আমার নিজের পাঁচটা বাচ্চা আছে। তাই এ ব্যাপারে আমি খুব ভালো বলতে পারব। তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনার সমর্থন। তারা আপনাকে গর্বিত করতে চায়। তারা যা যা করেছে সব আপনাকে দেখাতে চায়।

ধরুন, ফোনে আমি জরুরি কোনো কাজের আলাপ করছি। জরুরি একটা ফোন, আর এ সময় আমার দুই বছরের ছেলে এসে বলবে, ‘আব্বা আব্বা আব্বা আব্বা আব্বা।’

‘ভাই, একটু লাইনে থাকেন।’

‘কী হয়েছে বাবা?’

‘হে হে হে।’

ব্যস! আমি আবার ফোনালাপে ফিরে গেলাম, সে আবার আমাকে ডাকা শুরু করল। আমি বললাম, ‘আচ্ছা ঠিক আছে, কী হয়েছে বলো।’

‘আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।’

‘কী দেখাতে চাও বাবা?’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে।’ ব্যস এতটুকু বলেই সে চুপ।

কিন্তু আমার এ ক্ষেত্রে কী করা উচিত বলুন তো? ‘মাশা’আল্লাহ! দারুণ তো! আবার করো দেখি। ভাই, আমি আপনাকে পরে ফোন দিচ্ছি।’

আপনার সন্তানরা যা করে আপনার উচিত তার কদর করা। এটা তাদের পরম আরাধ্য। অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি তারা এটাই চায় আপনার কাছে।

আমার তিনটি মেয়ে আছে। ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য কী জানেন? ছেলেরা এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, আর মেয়েরা কথা বলা থামাতে পারে না। তো আমি আমার মেয়েদের স্কুল থেকে যখন নিয়ে আসি, একজন ক্লাস ওয়ানে আরেকজন ক্লাস খ্রিতে পড়ে। আমি ওদের স্কুল থেকে ২৫ মিনিট গাড়ি চালিয়ে বাসায় নিয়ে আসি। আর এই পুরোটা সময় তারা কী করে জানেন? ‘জানো আজকে ক্লাসে কী হয়েছে? আমরা একটা ডাইনোসর রং করেছি। এটা করেছি, ওটা করেছি। প্রথমে আমি বেগুনি রং করলাম, তারপর ভাবলাম একটু সবুজ রং-ও দিই’ সে এভাবে বলতে থাকল তো বলতেই থাকল। থামার কোনো নামই নেই। ওদের পক্ষে থামা সম্ভবই না। আর আমাকেও মনোযোগ দিয়ে অবশ্যই সেটা শুনতে হবে। আমি বললাম, ‘ও তাই! নীল রং দাওনি?’

‘না অল্ল একটু নীল দিয়েছি।’

আমাকে মনোযোগ দিতে হবে। আর আমি এগুলো কেন বলছি জানেন? আচ্ছা সেটা বলার আগে অন্য একটা গল্প বলে নিই। তাতে আপনাদের বিরক্তিটা একটু কাটবে।

এই গল্পটা আমি প্রায়ই বলি। আমার বড় মেয়েটা, হুসনা, যখন ছোট ছিল তখন আঙুল দিয়ে ছবি আঁকতে খুব পছন্দ করত। সে তার আঙুলগুলো রঙের মধ্যে চুবিয়ে তারপর সেগুলো দিয়ে হাবিজাবি আঁকত। সে একদিন বিশাল এক কার্ডবোর্ড নিয়ে সে আমার কাছে হাজির! সেখানে নীল রং দিয়ে বিশাল কী যেন আঁকা, আগামাথা কিছুই বুঝলাম না। সে বলল, ‘আব্বা, দেখো আমি কী এঁকেছি।’

‘বাহ, দারুণ! একটা পাহাড়!’

‘না, এটা তো আম্মু!’

‘হ্যা?’

‘আম্মুকে এই কথা বল না কিন্তু!’

যে কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি তা হলো, ওরা আপনার সমর্থন পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু আপনাদের যাদের সন্তানরা টিনেজার, তাদের যখন স্কুল থেকে আনতে যান, তারা কী এমন কলকল করে কথা বলে যায়? তারা কী বলে ‘জানো আজকে স্কুলে কী হয়েছে? টিচার এটা বলেছে, ওটা করেছে, পরীক্ষায় ‘এ’ পেয়েছি।’

না! তারা একদম চুপ করে থাকে!

তাহলে বরং আপনিই বলার চেষ্টা করবেন, ‘কেমন গেল দিন?’

‘মোটামুটি।’

‘কী করলে সারাদিন?’

‘কিছু একটা।’

‘আজকে কোথায় যাবে?’

‘যাব কোথাও।’

তারা কথাই বলে না! তাদের কথা বলানো অনেকটা পুলিশের আসামিকে জেরা করার মতো ব্যাপার। আপনাকে তারা কিছুই বলে না। আর যখন আপনি তাকে প্রশ্ন করছেন, তখন হয়তো সে তার বন্ধুকে এসএমএস পাঠাচ্ছে: ‘আব্বা আজকে বেশি প্রশ্ন করছে! ঘটনা কী? তুমি উনাকে কিছু বলেছ নাকি?’

ছোট বয়সে আপনার বাচ্চারা আপনার মনোযোগ পাওয়ার জন্য পাগল থাকে। আর যখন তারা বড় হবে, আপনি তাদের মনোযোগ পাওয়ার জন্য পাগল হবেন।

কিন্তু তারা যখন ছোট থাকে তখন যদি আপনি তাদের মনোযোগ না দেন তাহলে, ওরা বড় হতে হতে সম্পর্কটা শীতল হয়ে যাবে। তারা খেলনা নিয়ে আপনার কাছে এল আর আপনি বললেন, ‘ঘরে যাও! আমি সংবাদ দেখছি’, ‘এই, তুমি ওকে একটু সরাও তো!’ ‘সারাদিন অনেক কাজ করেছি, এখন ওকে সামলাতে পারব না’, ‘বাসায় আমার বন্ধুরা এসেছে, কী বলবে ওরা? যাও ঘুমাতে যাও। যাও এখান থেকে’। আপনি যখন ওদের সাথে এমন আচরণ করবেন, তারাও পরে আপনার সাথে এরকম আচরণ করবে। আপনার কাজ কি চাকরি করা, আর বাসায় এসেছেন শুধু বিশ্রাম নিতে? না রে ভাই! আপনার কাজ শুরু হয়েছে তখনই যখন আপনি ঘরে ফিরেছেন। সেটাই আপনার আসল কাজ। চাকরিতে যে কাজ করেছেন সেটা শুধুমাত্র এজন্য যেন, ঘরের আসল কাজটা ঠিকমতো করতে পারেন।

একজন প্রকৃত বাবা হন। পুরুষ পাঠকদের বলছি। একজন প্রকৃত বাবা হন। আপনার সন্তানদের সাথে সময় কাটান। তারা শুধু এ জন্য নেই যে আপনি তাদের স্কুলে ছেড়ে আসবেন, আর বাসায় ফিরে শুধু ঘুমাতে যাবেন। কোনো ঝামেলায় যাবেন না, তাদের সাথে কথা বলবেন না। তাদের সাথে কথা না বলার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে তাদের হাতে একটা আইপড টাচ অথবা আইফোন ধরিয়ে দেয়া। তাদের নিজস্ব রুমে হাই-স্পিড ইন্টারনেটসহ একটা কম্পিউটার বা ল্যাপটপ দিয়ে দেয়া। এমন হলে আপনাকে তাদের চেহারাও দেখা লাগবে না। তারা সারাদিন তাদের ঘরে থেকেই ফেসবুকিং করতে থাকবে, না হয় অনলাইনেই নিজেদের জন্য নতুন বাবা-মা খুঁজে নিবে। কিন্তু না, এমনটা কখনোই করবেন না।

সিরিয়াসলি বলছি। প্রকৃত বাবা হোন। প্রকৃত মা হোন। আপনার মাতৃত্ব বা পিতৃত্বের বদলি হিসেবে এইসব জিনিসকে আসতে দেবেন না। কারণ, যদি দেন,

তাহলে ওরা যখন স্বাবলম্বী হয়ে যাবে। তখন বেশির ভাগ বাবা-মায়ের কি হয় জানেন? আপনাদের বেশিরভাগের ছেলে-মেয়েরা আপনাদেরকে কতগুলো টাকার মেশিন হিসেবে দেখে। শুধুমাত্র কখন তারা আপনাদের কাছে আসে? 'বাবা, আমাকে ৫০ টাকা দাও তো।' জানি আজ-কাল কেউ আর ৫০ টাকা চায় না। কমপক্ষে ২০০ টাকা। কিছু বাচ্চাদের চিনি যারা এত কম টাকা দেখেইনি। ৫০ টাকার নোট চিনেই না তারা। 'আমাকে ৫০০ টাকা দাও তো।' 'শপিং মলে যেতে চাই, আমাকে একটু পৌছিয়ে দাও তো।' 'বন্ধুদের বাসায় যাই।' 'এটা কিনতে পারি।' 'ওটা কিনতে পারি।'

যখন তাদের কোনো কিছুর দরকার তখন তারা আপনার কাছে আসে। এর বাইরে আপনি তাদের খুঁজে পাবেন না। আর যখন তারা বড় হবে, নিজেরাই একটু-আধটু কামাই করতে পারবে, তখন কী হবে? আর তাদের দেখাই পাবেন না। কারণ, আপনার টাকার মেশিনও এখন আর দরকার নেই। এর প্রয়োজন শেষ। আপনি যদি এই ধরনের সম্পর্ক তৈরী করেন, তাহলে নিশ্চিত বিপর্যয়ের দিকে এগোচ্ছেন। আপনাকে এখনই পরিবর্তন আনতে হবে। আর পরিবর্তনের উপায় হলো জানি এটা অনেকের জন্যই করাটা কঠিন হবে, আমাদেরকে আমাদের সন্তানদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। আমাদের সাথে সময় কাটানোটা তাদের কাছে উপভোগ্য হতে হবে। আমাদেরকে হতে হবে তাদের কাছের মানুষ।

জোর করে বিয়ে

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন—

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

‘যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে চাও, তার ব্যাপারে সচেতন হও।’ সূরা নিসা : ৪

এরপর তিনি আরও বললেন, وَالْأَرْحَامَ -এর মানে সতর্ক হও, সচেতন হও।
গর্ভের সম্পর্কের মানুষদের ব্যাপারে ঋণী থাকার বোধ জাগাও।

পুরো অর্থটা তাহলে এই দাঁড়াল যে, গর্ভের সাথে যুক্ত যেকোনো বিষয়কে আমাদের কদর করতে হবে। যে কারণে, অন্যান্য পারিবারিক সম্পর্কগুলোর চেয়ে ইসলাম আমাদের মায়েদের অনেক সম্মান দেয়। তবে গর্ভের সাথে যুক্ত সম্পর্ক শুরু হয় বিয়ের মাধ্যমে। সেজন্য এই আয়াত শুরু হয়েছে এভাবে—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

‘হে লোকসকল, তোমাদের সেই প্রভুর ব্যাপারে সতর্ক থাক, যিনি এক আত্মা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সেখান থেকে তার সঙ্গীকে সৃষ্টি করেছেন।’ সূরা নিসা : ০১

এই আয়াতটি শুরু হয়েছে বিয়ের কথা বলে। আর তাই নবিজি ﷺ বিয়ের অনুষ্ঠানে এই আয়াত দিয়ে খুতবা শুরু করতেন। মোটামুটি যেকোনো বিয়েতে উপস্থিত থাকলে, আপনারা এই আয়াতটি শুনে থাকবেন।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অনেক পবিত্র একটি সম্পর্ক। একান্ত নিবিড় একটি সম্পর্ক। আল্লাহ কী বলছেন শুনুন:

وَأَخْذُنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

যার অর্থ হলো- ‘এই নারীরা তোমাদের থেকে এক পাকা কথা নিয়েছে।’

সূরা নিসা : ২১

আল্লাহ তায়ালা অনেক জোরালো ভাষায় এটি বলেছেন।

আমরা পুরুষরা ভাবি, বিয়ের সব নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে, তাই না? অথচ এই আয়াতটার প্রকাশভঙ্গী অদ্ভুত। এখানে বলা হচ্ছে, ‘আখায়না’; কিন্তু ‘আখায়তুম মিনহুনা’ নয়। মানে তোমরা তাদের থেকে কথা নাওনি। বরং তারাই তোমাদের থেকে কথা নিয়েছে। তারা তোমাদের দায়বদ্ধ করেছে। অর্থাৎ সিদ্ধান্তটা তারাই নিয়েছে।

এই বিষয়টি সামনে নিয়ে এলাম। কারণ, দুঃখজনকভাবে বেশিরভাগ মুসলিম সমাজে মেয়েদের নিজেদের পছন্দমতো বিয়ে করার সুযোগটা ছিনতাই করে নেয়া হয়েছে। মা-বাবারা মনে করেন, তারাই সব ভালো বোঝেন। তাদের ছেলে-মেয়েরা কিছু বোঝে না। সুতরাং, আমি আমার মেয়েকে যার সাথে ইচ্ছা, তার সাথে বিয়ে দেব। যাকে যোগ্য মনে করি, তার সাথেই দেব। তাকে সে পছন্দ করুক বা নাই করুক, এতে কিছু যায় আসে না। রাজি না থাকলে, মেয়েটি বোকামি করছে। আমি যদি কিছুক্ষণ তার সাথে চেষ্টামেচি করি, জোর গলায় কথা বলি, তাকে যথেষ্ট লজ্জিত করি, তাহলে একসময় তাকে মেনে নিতেই হবে। কারণ, সে তো আসলে কিছুই বোঝে না।

আমরা মেয়েদেরকে নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নিতে দিই না। নিদেনপক্ষে তাদেরকে ভাবারও অবকাশ দিই না। নির্মমভাবে তাদেরকে মানসিক চাপে ফেলে দিই।

কিছু কিছু মুরুবি এরকম করেন। আমাদের উপমহাদেশে তো এটা অহরহই হয়ে থাকে। মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য জায়গাতেও কমবেশি এমন হয়।

দেখবেন, কোনো প্রস্তাব এলে, নিজের লোকেরা বলবে, 'তুমি যে এত মোটা, বিশ্রী, কালো, বেঁটে তোমাকে কে বিয়ে করবে। এই যে এই ছেলেটা আসছে, এটাই তোমার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য। একে মেনে নিয়ে বিয়ে করে ফেল। এটাই তোমার জন্য ভালো হবে'।

তারা কিন্তু তার সুখের কথা ভেবে এগুলো বলেন না। মনে হয় কাঁধের উপর বুঝি টনকে টন বিশাল বোঝা ছিল। এখন কোনোভাবে এই বোঝা নামিয়ে ফেলতে পারলেই বাঁচা যায়। তাই কোনো এক পাত্রের সাথে কিছু শর্ত মিলে গেলেই সেই ছেলের ঘাড়ে মেয়েকে লটকে দেয়া হয়। আর এভাবে বেশ সংকটপূর্ণ একটি পরিস্থিতির তৈরি হয়।

মেয়েদের দিকগুলো অবশ্যই আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। তাদের চিন্তা, দর্শন, পছন্দকে শরীয়াহর মধ্যে থেকে সম্মান জানাতে হবে।

এক বোন আমাকে ইমেইল করেছিলেন, তিনি অন্তঃসত্ত্বা, মাশাআল্লাহ। তার স্বামী তাকে বলেছেন, ‘আমরা এখন সন্তানের ঝামেলা নিতে পারব না। তাই তার উচিত গর্ভপাত করে ফেলা’।

তিনি এটি কেমন করে বললেন, আমি বুঝতে পারছি না। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের পর্যাপ্ত রিয়্ক নেই, এটি সন্তান গ্রহণের জন্য উপযুক্ত সময় নয়’। আবার কিছু ধার্মিক জাস্টিফিকেশনও জুড়ে দিচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ! তিনি আরও বলেছেন, ‘প্রথম কয়েক মাসে ফেরেশতারা শরীরে রুহ প্রবেশ করান না, তাই বাচ্চাটিকে তখন মানুষ বলা যায় না। এটি কোনো ব্যাপার না।’

আমি অবশ্য ফাতওয়া দেয়ার মতো যোগ্যতা রাখি না। আর আমি এই কাজটি কখনো করবও না। অন্যান্য ধার্মিক বিচারের ব্যাপারে পরে আসি। এখানে প্রথম সমস্যা হচ্ছে, আমরা ভাবছি আমরা সন্তানের ভরণপোষণ করতে পারব না। আসল কারণ হলো, মানুষটা টাকা খরচ করতে চাইছে না, তাই না? এই টাকার জন্য তিনি একজন মানুষের জীবন নিতে রাজি আছেন। এটা তার চিন্তা। এটি সবচেয়ে জঘন্য আর অপমানজনক কাজ। আরবের মূর্তিপূজারীরা যে এমনটা করত সেটা কুরআনে বিশেষভাবে উল্লেখ করা আছে—

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

‘দারিদ্র্যের আশঙ্কায় তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না।
আমি তাদেরকে রিয়্ক দান করি এবং তোমাদেরকেও।’

সূরা বনি ইসরাঈল : ৩১

আর সে এই অংশটুকু ভুলে গেল! হ্যাঁ। এখন, তুমি যদি এই আয়াতের এই অংশ না মানো, এর মানে হলো তুমি পুরো আয়াতটাই অগ্রাহ্য করলে, তাই না? তুমি বুঝতে পারছ এর মানে কী দাঁড়ায়? তাহলে আল্লাহ তোমাকে রিয়ক দান করা থেকেও বিরত থাকবেন।

তুমি এই সন্তানের জন্য রিয়ক পাঠানোয় আল্লাহর রাস্তা বন্ধ করে দিলে। আর বাচ্চাটির দেখাশোনা করতে পারবে না বলে বাচ্চাটাকে মেরে ফেললে। অথচ আল্লাহ এখানে বলছেন, তুমি কি ভেবেছিলে তাদের রিয়কের ব্যবস্থা তুমি করছিলে? না! তা আমার কাজ। যেন আল্লাহ নিজে এর দায়িত্বে আছেন। যদি তুমি এই আয়াত অস্বীকার করো তবে তুমি তোমার জন্যে পাঠানো রিয়কও ফেলে দিচ্ছ।

এই মানুষটা যদি পয়সা খরচ করাকে সত্যিই ভয় পায়, তাহলে তো তার এসব কাজ থেকেও বিরত থাকা উচিত।

আর সেই বোন আমি এখনো তাকে রিপ্লাই দেইনি তবে, সম্ভবত আমি তাকে বলব, সে যেন নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। এটা তারও সন্তান। এই সন্তানটি, তার প্রতি আল্লাহর উপহার। কোনো স্বামীর এ ধরনের কথা বলার অধিকার নেই। এ ধরনের কাজে তাদের কোনো অধিকার নেই। এটি কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। জানি না তারা কীভাবে ভাবল, তাদের এমন অধিকার থাকতে পারে।

সুবহানাল্লাহ! এটি একটি জীবন, যার মালিক আল্লাহ। আমরা নই। আমাদের এখানে কিছু বলার অধিকার নেই। সত্যিই নেই। আল্লাহ এমন পরিস্থিতির শিকার হওয়া নারীদের জীবন সহজ করে দিক। কখনো কখনো স্ত্রীরা অবিবেচকের মতো কাজ করে, আবার কখনো স্বামীরা চরম গোলমালে কাজ করে বসে।

আচ্ছা, তাদের বেলায় কী হবে- ধরুন, তারা বিয়ে করেনি কিংবা এমন কেউ যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। শেষে তারা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছেন, আপনি তাদের ব্যাপারে কী বলবেন?

সেটা তো সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতি, কিন্তু সেক্ষেত্রেও গর্ভপাতের ব্যাপারটা আলাদা। এটি বলে রাখা উচিত যে, ওই ধরনের বাচ্চাদের অভিশাপ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। সমাজ ওদেরকে ‘আওলাদুয-যিনাহ’, এই-সেই আরও কত কী বলে। এই বাচ্চা বৈধ না হবার কারণে সে অন্যদের চেয়ে নীচ, ইসলাম এমনটা বিবেচনা করে না। ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে তো এটা তেমন কোনো সমস্যাই না।

বিয়ে-বহির্ভূত সন্তান সেখানে কোনো সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু ইস্টার্ন সোসাইটিতে কিংবা ধর্মীয় সংস্কৃতিতে মুসলিমদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এটা খুব বড় সমস্যা।

এখন যিনাহ্ হলো একটি জঘন্য কাজ। ধর্ষণ কিংবা যিনাহ্ যেটাই হয়ে থাকুক না কেন, এটা এমন অপরাধ যার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু অন্য একজনের অপরাধের দায় সেই বাচ্চার বয়ে বেড়ানোর পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। তাদের ক্ষেত্রে এমন হওয়া উচিত নয়। সেই মায়ের জন্যে এমনিতেই এটি খুব কষ্টের সময়।

তবে, এক্ষেত্রে আমি গর্ভপাতের ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। কারণ, আমার সেই যোগ্যতা নেই। আমি শুধু বলতে চাই, সেই বাচ্চাকে সমাজের কলঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়।

আর সেই বাচ্চাকে কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষার্থে আল্লাহর একটি আয়াতই যথেষ্ট। এই আয়াতটি আমাদের সব বুঝিয়ে দেবে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

‘আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি।’ সূরা বনি ইসরাঈল : ৭০

সেই বাচ্চাও আদম সন্তান, যার অর্থ হলো আল্লাহ তাকেও সম্মানিত করেছেন। এর অর্থ হলো, প্রেগনেন্সির এক পর্যায়ে রুহ্ নিয়ে ফেরেশতারা তার মায়ের কাছে এসেছিল, আর সেই রুহ্ এসেছিল আল্লাহর তরফ থেকে। এটা আল্লাহর দান। পবিত্র ফেরেশতারা সেই মায়ের কাছে এসেছিল, তাই না? তাদের কাছ থেকে আমরা তাদের সম্মান কেড়ে নিতে পারি না।

তবে, এক্ষেত্রে একটি জটিল বিষয় হলো গর্ভপাত করার ব্যাপারটা। আমি গর্ভপাতের ক্ষেত্রে কোনো যৌক্তিকতা দেখি না। তবে এই বিষয়ে ভিন্নমত থাকতে পারে, যা আমি জানি না। আমার এই বিষয়ে জ্ঞান নেই। এই মতামত দেয়া ইসলামি আইনজ্ঞদের কাজ। তবে নৈতিক দিক থেকে ভাবলে, যা বাচ্চার জন্যে সবচেয়ে ভালো হয়, সেটা অন্য ব্যাপার।

তো সবশেষে বলা যায়, সেই নারীর স্বামীর এই অধিকার নেই স্ত্রীকে গর্ভপাতের কথা বলার। এটা তার শরীর, সিদ্ধান্তও তার।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। সুবহানাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা মুসলিম নারীদের সহায় হোন।

সম্পাদকীয় ফুটনোট : গর্ভপাতের বিধান

গর্ভপাতের বিধান অবস্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত গর্ভস্থ ভ্রূণকে চার ভাগে ভাগ করা হয়।

১. ভ্রূণের বয়স ছয় মাসের অধিক। এই অবস্থায় কোনোভাবেই বাচ্চা নষ্ট করা বৈধ নয়। কারণ, ছয় মাসের অধিক হলে সিজারের মাধ্যমে বাচ্চাকে বের করে আনলে সে জীবিত থাকে।
২. ভ্রূণের বয়স ছয় মাসের কম, চার মাসের অধিক। এই অবস্থায়ও গর্ভপাত হারাম। তবে মাকে বাঁচানোর জন্য যদি গর্ভপাত করা অত্যাবশ্যিক হয় তাহলে একাধিক অভিজ্ঞ ডাক্তারের স্বীকৃতির শর্তে গর্ভপাত বৈধ। কারণ, ছয় মাসের কম বয়সের বাচ্চা সিজারের মাধ্যমে বের করলেও জীবিত থাকে না। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে বাচ্চার জীবন অনিশ্চিত আর মায়ের জীবন নিশ্চিত। তাই নিশ্চিত জীবনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অনিশ্চিত জীবনকে হত্যা করাটা যুক্তিসঙ্গত।
৩. ভ্রূণের বয়স চার মাসের কম। কিন্তু তার কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়ে গেছে। এই অবস্থায় বিনা কারণে গর্ভপাত করা মাকরুহে তাহরিমি। তবে শরঈ উয়র বশত গর্ভপাত করতে হলে মাকরুহ হবে না।
৪. ভ্রূণের বয়স এতটুকু যে, তার কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এখনও গঠিত হয়নি এই অবস্থায় গর্ভপাত মাকরুহে তানযীহী। তবে শরঈ উয়র থাকলে মাকরুহ নয়।

উল্লেখ্য যে, যেসব কারণকে উয়র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে তার মধ্যে কিছু হলো:

- ক. মায়ের দুধের অভাব থাকা। যার ফলে বাচ্চার অনিষ্ট হতে পারে।
- খ. মায়ের শারীরিক দুর্বলতার কারণে, মা ও বাচ্চা উভয়ের জীবন হুমকির সম্মুখীন হওয়া।
- গ. প্রথম বাচ্চার বয়স এত কম যে, এমতাবস্থায় নতুন করে গর্ভধারণ করলে প্রথম বাচ্চা অপুষ্টিতে ভুগবে; যা তার জীবনের জন্য ক্ষতিকর।
- ঘ. প্রথম বাচ্চা এত ছোট যে, নতুন বাচ্চা জন্ম নিলে দুজনকে একসাথে দেখভাল করাটা কষ্টকর হতে পারে।

[প্রমাণপঞ্জি: আদুররুল মুখতার ১০/২৫৪), ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক ১/৩৯৯, আলবাহরুর রায়েক ৮/৩৭৯, ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা-২৪৪]

বিয়ে : পছন্দ-অপছন্দ ও চাপানো

আমার কাছে অনেক খবর আসছে। বিয়ে করার জন্য মেয়েদেরকে মানসিকভাবে চাপ দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, 'তুমি যদি অমুককে বিয়ে না কর, তাহলে তোমাকে আর কেউ বিয়েই করবে না। তোমার নিজের অবস্থার দিকে তাকাও... ইত্যাদি ইত্যাদি'।

বাবা-মায়েরা তাদের মেয়েকে হয়রান করছেন। তাদের বলছেন, 'তোমাকে শিগগিরই বিয়ে করতে হবে। তোমার জন্য যেন আমাদের ছোট হতে না হয়। তোমার কারণে আমাদের পরিবারের দুর্নাম যেন না হয়। এর পরেরবার প্রস্তাব আসলে অবশ্যই রাজি হয়ে যাবে।' আর এভাবেই এই মেয়েগুলো প্রতিনিয়তই চাপের মুখোমুখি হতে থাকে। এটা হলো একটা দিক।

আরেকটা দিক হলো, মেয়েরা কাউকে পছন্দ করলে, তা প্রকাশ করতে পারে না। আমি এই কথাটা তাদের উদ্দেশ্যে বলছি না, যারা ডেটিং করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোনো মেয়ে যদি কারো ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে আমাদের সমাজে এটাকে জঘন্য কাজ হিসেবে দেখা হয়। যেন সে চরম কোনো অপরাধ করে ফেলেছে।

ইসলামে জোরজবরদস্তি করে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার কোনোই স্থান নেই। প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিয়েতে অবশ্যই মেয়ের সম্মতি থাকতে হবে।

তাও আবার ‘অনিচ্ছাকৃত’ সম্মতি নয়; রাজি হওয়ার ব্যাপারে তাকে খোলামেলা এবং খুশি থাকতে হবে। অর্থাৎ তারা প্রকৃতপক্ষেই বিয়েতে সম্মত আছে।

এমন না যে, ‘আমার বাবা-মা যেহেতু বলছে, তাই আমার আর কিছুই বলার নেই...’

হাদিসের এসেছে—

‘খুনাসা (রা.) নামে এক নারীকে তার পিতা বিয়ে দেন। এই বিয়ে তার পছন্দ ছিল না। এরপর রাসূল ﷺ-এর কাছে গেলে তিনি এই বিয়ে বাতিল করে দেন। সহিহ বুখারি : ৪৭৬২

আপনি চিন্তা করতে পারেন? লোকেরা কেন এমন করে? চাপ দিয়ে বিয়ে দেয়া যে একদম নিষিদ্ধ, তা কেবল জানাই যথেষ্ট না। কারণ, মানুষ হারাম জানার পরেও অনেক কাজ করে থাকে। এর একটা মনস্তাত্ত্বিক দিকও আছে। এই মানুষগুলো তাদের সন্তানের সুখের চেয়ে নিজের সুখের ব্যাপারে বেশি সচেতন। তাদের নাম, বংশ, সমাজের সামনে তাদের কেমন লাগবে এসব ভুয়া চিন্তা যেগুলো বাস্তবে পুরো অর্থহীন, সেগুলোই কিনা তাদের কাছে সন্তানদের জীবনভর সুখ-শান্তির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বিয়েটা এখন একটা অনুষ্ঠানসর্বস্ব বিষয় হয়ে গেছে। ‘কতজন মানুষ বিয়েতে আসবে’, ‘আমরা এই হলটায় অনুষ্ঠান করব’, ‘আমরা এটা করব, সেটা করব’, ‘ওই পরিবারের সাথে আমাদের বেশ ভালো সম্পর্ক হবে’, ‘আমরা অনেক ভালো পাত্র পেয়েছি’ পুরো বিয়েশাদি এখন এরকম কিছু বিষয়ের ব্যাপার হয়ে গেছে।

তারা আসলে ভালো পাত্র পায়নি, তারা কেবল একটা ভালো সিঁড়ি পেয়েছে। তারা খোঁজে পাত্র অমুক এলাকার কিনা, তাঁর এই এই যোগ্যতা আছে কিনা। অনর্থক সব বিষয়।

আর পাত্রের ব্যাপারে আশেপাশে অনেক ভালো খবর গুনলেও, বাস্তব জীবনে সম্পূর্ণ খারাপ চরিত্রের হতে পারে। আমি অনেক ঘটনা জানি যে, চুলচেরা সন্ধান চালিয়ে একই মহল্লার পাত্র খুঁজে তাঁর সাথে মেয়ের বিয়ে দেয়া হয়েছে। আর দুসপ্তাহ পর দেখা যায় যে, সে মেয়েকে পিটিয়ে প্রায় মেরে ফেলার মতো অবস্থা করে ফেলেছে।

এমন পরিস্থিতিতে পরিবারের উচিত ছিল, তাদের ভুল স্বীকার করা। কিন্তু তারা উল্টো মেয়েকে বলবে, ‘না না, তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে’, ‘বাইরে যেন এ ব্যাপারে জানাজানি না হয়, তাহলে আমাদের মান-সম্মান থাকবে না’।

বিয়ে দিনের অর্ধেক আর তারা মানুষের বিয়ে ধ্বংস করে বেড়াচ্ছে। এই লোকগুলো বাস্তবে ছেলে-মেয়েদের দিন থেকেই দূরে ঠেলে দিচ্ছে। তাঁদের সাবধান হওয়া উচিত। তারা শুধু তাঁদের সন্তানদেরই ঝামেলায় ফেলছেন না, তাঁরা নিজেরাই আল্লাহর সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছেন।

সন্তানদের সুখ ও সম্মতির বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, সন্তানের বিয়েশাদির সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় তিনি যেন আমাদেরকে বিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ অভিভাবক বানিয়ে দেন। আল্লাহ যেন আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকেও বড় হওয়ার সাথে সাথে সঠিক, সুবিবেচিত সিদ্ধান্ত নেয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

বারাকাল্লাহ্ লি ওয়ালাকুম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

পতনপূর্ব অহংকার

কোনো কিছু স্বীকৃতি পেলে মানুষের মধ্যে আত্মগৌরব তৈরি হয়। বাবা যদি কোনো এক সন্তানকে অন্য সন্তানদের সামনে প্রশংসা করে বলেন, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত’। তখন অন্য সন্তানের কী হয়? মনে মনে সে রাগে ফুঁসে ওঠে। বাবা যদি এক সন্তানকে বলেন, ‘আমার গাড়িটা পরিষ্কার করে দাও। তুমি এটা ভালো পারো’। অন্য সন্তান হয়তো গাড়ি পরিষ্কার করতে চায় না, সে বরং টিভি দেখতেই পছন্দ করে; কিন্তু তারপরও সে অসন্তুষ্ট! কারণ, বাবা আমাকে কেন বলল না? আমার কি সামান্য একটা গাড়ি পরিষ্কার করার মতো যোগ্যতাও নেই? তিনি বললে আমি হয়তো বলতাম, ‘আমি বরং ভিডিও গেইমই খেলব’। কিন্তু ঘটনা হলো তিনি আমাকে সামান্য জিজ্ঞেসও করলেন না? এটা তো আমার মনের ভেতর হাতুড়ি পেটা করছে। এখানে আসলে স্বীকৃতি পাওয়ার তীব্র বাসনা কাজ করছে।

ইবলিস নিজেকে বড় বলে অহংকারী স্বীকৃতি চাইত। কার কাছ থেকে? আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে। যদিও এর সাথে দায়দায়িত্ব পালনের ব্যাপার জড়িত। এটা কোনো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান নয় যে, সে পৃথিবীতে রাজত্ব পাবে বা যা চায় তাই পাবে। প্রকৃতপক্ষে, দুনিয়াতে মানব জীবন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

‘নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।’ সূরা বাল্লাদ : ৪

নিজেকে আর নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মানুষকে প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করতে হয়। দুইটা বাড়তি আয়ের জন্য, মানুষের সাথে চলার জন্য, সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বাস্তবে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এসব সহজ কাজ নয়। তারপরও আদম আলাইহিস সালামকে যে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, তা ইবলিস সহ্য করতে পারেনি। কেন আদমকে স্বীকৃতি দেয়া হলো? কেন আমাকে নয়? অন্যের থেকে বড় স্বীকৃতির এই তীব্র তৃষ্ণা মানুষকেও শয়তানে পরিণত করতে পারে।

ঘটনা প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলি। এটি সেই একই স্বীকৃতির তৃষ্ণা, যার ফলে মানব ইতিহাসের প্রথম হত্যাকাণ্ড হাবিল-কাবিলের মাঝে সংঘটিত হয়। এর বিবরণ সূরা আ'রাফে আছে। আর এই প্রথম হত্যাকাণ্ড কিন্তু টাকার জন্য হয়নি, সম্পত্তি বা এরকম কোনো কারণেও না।

তারা দুজনেই কুরবানী পেশ করেছিল। একজনেরটা গ্রহণ করা হয়েছিল, অন্যজনেরটা হয়নি। এক জনেরটা স্বীকৃতি পেয়েছিল, অন্যজনেরটা পায়নি। লক্ষ্য করুন, সেই একই হিংসা এখানে কাজ করছিল।

কী কারণে নবি ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা মারাত্মক প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে পড়েছিল? তারা তো তাকে প্রায় খুনই করে ফেলেছিল। তারা জঙ্গলের মধ্যে নির্জন কুয়ায় তাঁকে ফেলে দিয়েছিল। সেখানে তো সাপ আর বিচ্ছু থাকার কথা। সেটি ছিল ভীষণ দুর্গম কোনো নির্জন প্রান্তরের একটা গর্ত। তবুও তারা তাদের ভাইকে সেখানে ফেলে দিয়েছিল। জানেন কেন? কারণ, তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে যে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, তা অন্য ভাইয়েরা পায়নি। একারণে তারা হিংসাত্মক হয়ে উঠেছিল।

এখন এই 'স্বীকৃতি' জিনিসটাকে আপনারা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন।

যখন আমরা আত্মমর্যাদা সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন আত্মমর্যাদাকে অর্থ-বিল্ড, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ইত্যাদির সাথে যুক্ত করি। কিন্তু আমি মনে করি, এসব বিষয় মানুষের স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার কাছে খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। শয়তান আপনার ভিতর প্রশংসা পাওয়ার, স্বীকৃতি পাওয়ার, দৃষ্টি আকর্ষণ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করবে।

আপনি সমাজে অনেক লোক পাবেন, যারা ইসলামের নামে কাজ করছেন, মসজিদের জন্য কাজ করছেন। এসব কাজ কিন্তু কোনো আরামের কাজ নয়।

জোনিং এর জন্য আবেদন করা, পার্কিংলট মেরামত করা, কন্ট্রাক্টরদের সাথে কথা বলা, অজুর জায়গার রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং আরো অনেক কিছু এগুলো কোনো মজার কাজ নয়। এসব লোকের মাঝে এমন লোকেরাও আছে যারা চাকরি থেকে সময় বের করে, পরিবারকে ফেলে রেখে, মসজিদের বোর্ড মেম্বার হন, ভলান্টিয়ার হন, কীভাবে টাকা খরচ করবেন এজন্য মিটিং এর পর মিটিং করে যান। কী কী উদ্যোগ নেয়া যায়, কোন কোন জায়গা মেরামত করতে হবে ইত্যাদি নিয়ে ভাবেন।

এদের মধ্যে এমন কাউকে পাবেন, যে বিভ্রাট। তার ভিতর এই শক্ত মনোভাব কাজ করে যে, আমাকে মসজিদের প্রেসিডেন্ট হতেই হবে। আরে ভাই, আপনি হয়তো ইতিমধ্যে আপনার ডিপার্টমেন্টের প্রধান অথবা ডাক্তার; যার পেছনে নার্সরা আদেশের অপেক্ষায় থাকে। উপরন্তু আপনার ঘরের প্রধানও আপনি। আপনার রয়েছে অর্থ-বিল্ড, এসব কিছুতে আপনিই প্রধান। কিন্তু এরপরও আপনি ভাবেন, এক জায়গায় আমাকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। তারা তো স্বীকৃতি দিচ্ছে না যে, আমি তাদের জন্য কত কিছু করলাম। আমি আমার মর্যাদার যথাযথ স্বীকৃতি মসজিদ থেকে পাচ্ছি না। আমাকে অবশ্যই মসজিদের মহীয়ান শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এমন কি মসজিদের ভিতরেও!

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

‘মসজিদগুলো আল্লাহর জন্য। তাই তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে ডেকো না।’ সূরা জিন : ১৮

কথা প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমি বিশেষভাবে কারও প্রতি ইঙ্গিত করছি না। এটা আমার উদ্ভাবনী কল্পনা মাত্র। এই অবস্থা যে কারও ব্যাপারেই হতে পারে। এমনকি হয়তো কারও কোনো পেশাই নেই। কিন্তু সে যখন মসজিদে আসে, তখন স্বীকৃতি, ভোটাভোটি, নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠে। এ তো যেন রিপাবলিকান বনাম ডেমোক্র্যাটের মতো অবস্থা! তাও আবার মসজিদের ভিতর! কিন্তু কেন? আপনি কি জিতছেন? অন্য সবার থেকে বড় হতে চাওয়া, সবার চোখে বড় হতে চাওয়া, সবার বিবেচনায় বড় হতে চাওয়া, সমস্ত কৃতিত্ব নিজের দিকে টেনে নেয়া- এগুলো আসলে কী?

এই যে মাথার ভিতর গেঁথে আছে, মানুষ আপনাকে আপনার অবদান দেখে সম্মান দেবে, এটাই তো আসলে ইস্তিকবার। বড়ত্ব, দাস্তিকতা, অহমিকা, এখানে কিন্তু কোনো বৈষয়িক প্রাপ্তিই নেই। বাহ্যিক কোনো উপকারই এসব আচরণ থেকে বের হয়ে আসে না।

এটা কিন্তু একটা রোগ। এটা যেমন আপনার বৈষয়িক জীবনে ক্ষতি করে, তেমনি মানবতার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই এই অহংকার ক্ষতি করে। মানুষের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই এটি আঘাতের মাধ্যমে ক্ষতি করে। অহংকার পারিবারিক সম্পর্কেও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পরিবারের ভিতর এমন স্বামী থাকতে পারেন, যিনি সারাক্ষণ তার অবদানের স্বীকৃতি খুঁজছেন। তিনি সারাক্ষণ রাগ ঝেড়েই যাচ্ছেন, আমি তোমাদের জন্য এত কিছু করলাম আর তোমরা আমার কোনো মর্যাদাই দিলে না! সর্বশেষ, তোমরা কখনো আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলে? তিনি যেন সারাক্ষণ স্বীকৃতির জন্য উত্তেজিত। তিনি যেন নিজের সামান্য এক ঘরের অ্যাপার্টমেন্টের ভিতরই এক ফেরাউন। তার যেন ফেরাউনের সেই 'আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা' ঘোষণার দরকার।

আপনি হয়তো এক ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। সেখানে মাত্র পাঁচ-ছয়জন একত্রে কাজ করে। আমি নিশ্চিত এমনও সামান্য কাজ আছে, যা হয়তো আপনি খুব ঠেকে না গেলে করবেনই না। যেমন, পরিচ্ছন্নতা ডিপার্টমেন্টের ট্রাক একজন ড্রাইভ করেন। আর অন্যজন পেছনে বুলে থাকেন, তিনি আবর্জনা কুড়িয়ে ট্রাকে ভরেন। অন্যদিকে যিনি সামনে আছেন, তিনি অহংকারে ভাবছেন, হুম..., আমিই তো ড্রাইভার। আসলে এই ছোট জগতের তিনিই তো ফেরাউন। তিনিই ইস্তিকবারে আক্রান্ত হয়েছেন। কারণ, তিনি বিরাট কিছু একটা হয়ে গেছেন বলে নিজেকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। এই ইগো বা আত্মহমিকার প্রতিযোগিতা আপনার অফিসের ভিতর, আপনার ডিপার্টমেন্টের ভিতর, আপনার টিমের ভিতর, বিভিন্ন টিমের ভিতর, এমনকি এটা বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতরেও ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, এই আত্মহমিকার প্রতিযোগিতা পরিবারের ভিতরে, এমনকি আপন ভাই-বোনদের ভিতরেও কাজ করে।

বাস্তবতা হলো, ভাই-বোনদের ভিতর আত্মহমিকার প্রতিযোগিতা তো সবচেয়ে মারাত্মক। বলা যায় এটা এক ধরনের অনিবার্য সংঘাত। এজন্যই কোনো এক সন্তান ভাবে অন্যজনের উপর বাবার সমস্ত আগ্রহ চলে গেছে।

সে বেশি লম্বা বা স্কুলে ভালো গ্রেড পায় এজন্য। অন্যজনকে বাবা কি আমার থেকে বেশি ভালো বলে মনে করে?

দুঃখজনকভাবে আমরা পিতা-মাতারা সন্তানদের এই পরিস্থিতিতে কোনো সাহায্য তো করিই না, উপরন্তু একজনের একশত পাওয়াকে অন্যসব সন্তানদের গালে শক্ত চপটোঘাতের মতো করে কালিমা লেপন করি। তার মার্কশিট উঁচু করে ধরে অন্যদের বলি, এজন্যই অন্য সবার থেকে আমি তাকে বেশি ভালোবাসি। এজন্যই এই... এজন্যই সেই... সে যেমন দেখতেও ভালো, বুদ্ধিতেও তেমন।

যে বাচ্চাগুলোকে শোনাচ্ছেন, এগুলো তাদের মনে অন্তরজ্বালা দিচ্ছে। তারা রাগে ফুঁসেই যাচ্ছে। আর আপনি অবাক হন, কেন তারা এত হিংস্রভাবে মারামারি করে। সে তার ভাইয়ের খেলনা নিয়েই ভেঙে ফেলে। খেলে না, ধরেই দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে চূপ করে থাকে। বাবা-মা দৌড়ে এসে ধমক দিয়ে যখন জিজ্ঞেস করে, কেন তুমি এটা সবসময় কর? তখন সে ফোঁপাতে থাকে। মনে মনে বলে, তুমি তাকে বেশি ভালোবাস। এমনকি তুমি তার খেলনাকেও আমার থেকে বেশি ভালোবাস। ছোটবেলা থেকেই এটা মানুষের ভিতরে কাজ করে।

একেই বলে ইস্তিকবার বা বড়ত্ববোধ। শয়তানের এটা ছিল। তাই সে মানুষের ভিতরেও তার অনুপ্রবেশ করাতে চায়। এটাই তাকে ধ্বংস করেছে। তাই সে নিশ্চিত করতে চায়, যেন প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরই তা কাজ করে। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এই সমস্যাকে আমরা কীভাবে মোকাবিলা করব।

মা-বাবার সাথে

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَهِمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَخُفِّضْ
لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝

‘তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত
করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা
উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ষিক্য উপনীত হয়; তবে তাদেরকে ‘উফ’
শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বলো তাদেরকে
শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত
করে দাও এবং বলো, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর,
যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।’

এটি, সূরা আল-ইসরার ২৩ ও ২৪ নাম্বার আয়াত। এই আয়াতের আলোকে
আমি মা-বাবার সাথে সন্তানের আচার-আচরণ কেমন হওয়া উচিত, সেটা নিয়ে
কথা বলব।

আল্লাহ আয়াতটার শুরু করলেন এই বলে-

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

যার অর্থ হলো, তোমাদের রব আদেশ করছেন তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদাত করবে না। আয়াতের প্রথম অংশ আমাদের ওপর আল্লাহর অধিকারের ব্যাপারে দাবি জানাচ্ছে। আর দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে—

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

‘তুমি অবশ্যই তোমার পিতা-মাতার সাথে সর্বোত্তম আচরণ করবে।’ ভাষাগত ব্যাকরণে না গিয়ে বলা যায় যে, ‘ইহসানা’ শব্দটি দ্বারা এখানে জোরালো উপদেশ দেয়া হয়েছে। আপনি তাদের সাথে যথাসম্ভব ভালো ব্যবহার করবেন। আয়াতের বাকি অংশ শুধুই মা-বাবার সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে। প্রথমে আল্লাহ বলছেন, ‘তুমি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করবে’, এরপর তিনি বলেন—

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ

‘তারা যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়’

أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا

‘...তাদের মধ্যে একজন অথবা উভয়েই...’

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُنِّ

‘...তাদেরকে ‘উফ’ শব্দটিও বলো না’

আমি এ ব্যাপারটায় একটু পরেই ফিরে আসব।

وَلَا تَنْهَرْهُمَا

‘... আর তাদেরকে ধমক দিয়ো না বা দূরে ঠেলে দিও না...’

وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

‘আর তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো।’

একটার পর আরেকটা, তারপর আরেকটা। এভাবে একের পর এক শুধুই পিতা-মাতাকে নিয়ে বলা হয়েছে। মাত্র একবার আল্লাহর সম্পর্কে বলা হয়েছে, আর বাকি সব অংশ পিতা-মাতার ব্যাপারে কথা বলছে। চিন্তা করে দেখুন, এ বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ!

এ আয়াতের সুন্দর দিক হচ্ছে, গুরুত্বে আল্লাহ নিজেকে উল্লেখ করেছেন। এরপর মা-বাবার ব্যাপারটা। আপনি যদি আল্লাহর একজন ভালো বান্দা হতে না পারেন, তাহলে মা-বাবার সাথেও আপনার আচার-আচরণ ভালো হবে না।

প্রথম অংশটি যথার্থভাবে পালন না করলে, দ্বিতীয় অংশে এসেও আপনি ব্যর্থ হবেন। মা-বাবার সাথে আপনাদের কারও আচার-আচরণ খারাপ হওয়ার মানে আপনি আসলে এখনো আল্লাহর ভালো বান্দা হতে পারেননি। আপনার প্রথম করণীয় কাজটি এখনো করেননি। পরেরটা করা আপনার জন্য সহজ হয়ে যেত, যদি আপনি তার আগেরটা করতেন। এটি হলো প্রথম পয়েন্ট।

দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো, সর্বোত্তম হওয়া বলতে আসলে কী বুঝায়? এখানে বলা হচ্ছে, ‘ওয়াবিল-ওয়ালিদাইনি...’ এখানে ‘ওয়া ইহসানান বিল ওয়ালিদাইনি’ বলা হয়নি। তাহলে এটার ভিন্ন অর্থ হতো। ‘ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানান’-এর মানে হচ্ছে, ‘বিশেষভাবে’ আপনার পিতা-মাতার কথা বলা হচ্ছে। অন্যদের সাপেক্ষে যখনই পিতা-মাতার ব্যাপার চলে আসে, আপনি তাদের কাছে সর্বোত্তম হবেন। অন্য কথায়, নিজের বসের কাছে ভালো হওয়া খুবই সহজ। কেননা, আপনি তার সাথে ঝামেলায় জড়ালে নিজেই বিপদে পড়বেন। আপনার প্রফেসরের সাথে ভালো আচরণ করা স্বাভাবিক। কারণ, তিনি আপনাকে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দিতে পারেন। একইভাবে আপনার বন্ধুদের কাছেও, কেননা আপনি তাদের হারাতে চান না। কিন্তু যখনই আপনার পিতা-মাতার কথা আসে, তখন আপনি অনেকটা রিলাক্সড! ও, বাবা-মা? উনারা তো সারাজীবন আমারই। তাই আল্লাহ বলছেন, নাহ। ব্যাপারটা এত হালকা না। আল্লাহ তায়ালার অধিকারের পরেই পিতা-মাতার অধিকারের ব্যাপারটা আলোচনা করার বিশেষ একটা গুরুত্ব আছে।

ধরুন, আপনি ফোনে বন্ধুর সাথে কথা বলছেন, আর আপনার মা আপনাকে ডাক দিল। আপনি তখনই তার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাবেন। ব্যাস! এখানে আর কোনো ‘কিন্তু’ নেই। আপনি ভিডিও গেমস খেলছেন আর আপনার মা বললেন, ‘নাস্তা রেডি!’ আপনি বলবেন না, ‘দাঁড়াও না! বললাম তো আসছি! একটু বসে থাকো!’ এগুলো চলবে না। সাথেই সাথেই সেটাকে রেখে দিন। চলে যান। আমি আপনার বাসায় থাকলে আপনার টিভিটাই ভেঙে ফেলতাম। ‘যান আপনার মায়ের কথা শুনে আসুন।’ এটা আমাদের দিনের একটি প্রাথমিক দায়িত্ব।

এরপর আল্লাহ বলেন, ‘তাদের একজন বা দুজনই যখন বার্বাক্যে উপনীত হোন’ তখন বিষয়টা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, যখন আমাদের পিতা-মাতার বয়স বাড়তে থাকে, তার সাথে সাথে তাদের প্রয়োজনও বাড়তে থাকে।

একদিকে তাদের বয়স বাড়ছে আর আপনি স্বাধীন হচ্ছেন। প্রাপ্তবয়স্ক হচ্ছেন। আপনি তখন ভাবেন, নিজের সিদ্ধান্তগুলো নিজেই নেবেন। এখন আপনার নিজের একটা জীবন আছে। তারা এখনও আপনাকে বাচ্চা হিসেবে দেখছে, তারা আপনাকে বুঝতে পারে না- এরকম নানা অভিযোগ আপনার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। আপনি আপনার বন্ধুদের কাছে এগুলো বলে বেড়ান।

কিন্তু আল্লাহ বলছেন যে, ‘বিশেষভাবে’ যখন তারা বৃদ্ধ হয়ে পড়ে, ‘বিশেষভাবে’ যখন তারা অযৌক্তিক হয়ে যায়, ‘বিশেষভাবে’ যখন তারা আর আপনার অবস্থা বুঝতে পারে না, আপনার ওপর নানা দাবি-দাওয়া চাপাতে থাকে, তখনই সময় তাদের কাছে সর্বোত্তম হওয়ার। আর যে আল্লাহর ভালো বান্দা নয়, তার কাছে এটা মোটেও সহজ হবে না। এগুলো তাদের জন্য না; বরং আল্লাহর জন্য করতে হবে। এটা হলো দ্বিতীয় দিক।

তারপর তিনি বলেন, ‘ওয়ালা তানহার হুমা’। ‘তাদেরকে ধমক দিও না কিংবা দূরে সরিয়ে দিও না’। ভিক্ষুকদের ব্যাপারে ঠিক একই আদেশ নবি ﷺ-কে দেয়া হয়েছিল। ওয়া আম্মাসসা-ইলা ফালা তানহার। একই রকম শব্দ, তাই না? ‘ভিক্ষুকদেরকে ধমক দিও না, তাদের দূরে ঠেলে দিও না।’

মা-বাবাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন না। আপনার মা আপনার সাথে কথা বলছে, আর আপনি হুট করে চলে যান অথবা আপনি কথা বলার সময় তার দিকে তাকানও না। আপনার লজ্জা হওয়া উচিত। মায়ের সাথে কীভাবে আপনি এমনটা করতে পারেন? আপনার জন্য তিনি কতই-না কষ্টের মধ্যে দিয়ে গেছেন। আর আপনি তার সব কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে বলতে থাকেন ‘আরে বুড়িটা সারাক্ষণ চেষ্টামেচি করে, বকবক করে...’

কী চরম অকৃতজ্ঞতা! শুধু আপনার মায়ের প্রতি না, প্রথমে আল্লাহর উপর, তারপর আপনার মায়ের উপর। আপনি কি ভুলে গেছেন, আপনি তার গর্ভের মধ্যে ছিলেন? যে কারণে একটু পরপরই তার বমি হতো। ভেতর থেকে আপনি তার পাঁজরে লাথি মারতেন। আর পেট থেকে বের হওয়ার সময় আপনি তাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন। কত ব্যথা-বেদনার মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে লালন-পালন করেছেন। রাতে কখনো কখনো ঘুমোতে পর্যন্ত যাননি।

অথচ এখন সব দিব্যি ভুলে গেছেন। আর তাই এমন আচরণ করছেন। আপনার মনে নেই বলে আপনি তাদের সাথে যাচ্ছেতাই ভাবে কথা বলেন।

‘ওয়া কুল লাহুমা কওলান কারিমা, অর্থাৎ ‘তাদের উভয়ের সাথে সম্মানের সাথে, শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো।’

আপনাদের অনেকেরই মুখ দিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মতো বাজে শব্দ, খারাপ ভাষা বের হতে থাকে। আপনি এগুলো বলার সময় একটুও চিন্তা করেন না। পিতা-মাতার সাথে কথা বলার সময় আপনার অবশ্যই এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর এমনিতেও এসব ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়। বিশেষ করে পিতা-মাতার সাথে তো তা কোনোভাবেই না।

এরপরে আরও একটি আয়াত পিতা-মাতাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। যেখানে বলা হচ্ছে—

وَخُفِّضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ

‘তাদের দুজনের জন্য তোমার কোমলতা ও বিনয়ের ডানা অবনত করো।’

সূরা বনি ইসরাঈল : ২৪

আরবিতে ডানা নত করার অর্থ হলো, আপনার পাখির মতো উড়ে যাওয়ার ক্ষমতা আছে; কিন্তু তারপরেও আপনি নিচে যেকোনো জায়গায় নেমে আসেন। আপনার চলে যাওয়ার ক্ষমতা আছে; তাদের মুখের সামনে জোরে দরজা লাগিয়ে দিতে পারেন কিংবা ফোন কেটে দিতে পারেন। তবুও এগুলো সহ্য করেন, তাদের বকবকানি মেনে নেন।

আপনি হয়তো আমাকে বলেন বা ফেসবুক পেজে লিখবেন, ‘নোমান ভাই, আপনি বুঝতে পারছেন না। আমার পিতা-মাতার মাথা পুরো নষ্ট হয়ে গেছে’ অথবা ‘আমার ব্যাপারটা পুরো আলাদা...’

কী মনে হচ্ছে? প্রত্যেকেই ভাবে যে, তাদের অবস্থাটা অন্যদের থেকে আলাদা। কেউ ভাবে না যে, এগুলো তাদের ক্ষেত্রে খাটে। সবাই মনে করে, এই কথাগুলো পাশের কাউকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে।

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে খুব ভালো করেই জানেন। তিনি আমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থেকেই এ কথাগুলো বলেছেন। তাই তাদের প্রতি বিনয়ের ডানা অবনত করুন।

আমার শেষ মন্তব্য আয়াতের শেষ অংশকে নিয়ে। যেখানে বলা হয়েছে, ‘মিনার রহমাহ’ অর্থাৎ দয়া পরবশ হয়ে। এটি অন্তত তিনটি দিক বুঝায়।

প্রথমত, আপনি তাদের প্রতি বিনয়ী হবেন, যদিও তার বিপরীত হবার ক্ষমতা আপনার আছে। আপনি তা করবেন কারণ, তারা এমন বয়সে উপনীত হয়েছে, যখন আপনার দয়া তাদের খুব প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, আপনি ছোট থাকা অবস্থায় তারা আপনার প্রতি দয়া করেছিল। আর তারা কিন্তু এসব কিছু রেকর্ডে লিখে রেখে বিল বানিয়ে আপনাকে দিয়ে বলেনি, ‘দেখ, আমরা তোমার এত সেবা-যত্ন করেছি, এত ঘণ্টা তোমার পেছনে শ্রম দিয়েছি। এখন এর মূল্য পরিশোধ কর।’

না, তারা আপনাকে দয়া দেখিয়েছে; এখন আপনারও তাদের প্রতি দয়া করার সময় এসেছে।

তৃতীয় এবং সর্বশেষ পয়েন্ট হলো, আপনি যদি চান আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুক, আপনি তাদের প্রতি দয়া দেখান।

আল্লাহ আমাদেরকে পিতা-মাতার সাথে সর্বোত্তম বানিয়ে দিন। আর তিনি যেন আমাদের এই আয়াতগুলো উপলব্ধি ও তদানুযায়ী জীবনযাপন করার তাওফিক দান করেন। বারাকাল্লাহ্ লি ওয়ালাকুম ফিল কুরআনিল হাকিম।

বিধবা বিয়ে : ভুলে যাওয়া সুন্নাহ

সূরা নূরের দুটো আয়াত নিয়ে কথা বলব এখন। আমরা শুধু বিয়ে নামক ব্যবস্থাটিকে না, সমাজে মানুষকে কীভাবে বিয়ে দেয়া যায়, সেটাও বুঝব।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালায় চেয়ে অলংকারময় ভাষায় আর কেউ কখনো কথা বলেনি। অল্প কথায়, সহজভাবে তিনি বিভিন্ন বিষয় চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। যে আয়াতটা নিয়ে কথা বলব, সেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, কীভাবে একটা মুসলিম সমাজ ও মুসলিম পরিবার তাদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করবে। বিষয়টা শুধু আপনার নিজের ছেলে-মেয়েদের বিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

এই আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হয়, তখন বহু মানুষ সবেমাত্র ইসলামে এসেছে। যে কারণে তাদের অনেকের কোনো মুসলিম পরিবার ছিল না। অনেক মেয়েদের বাবা-মা মুসলিম ছিলেন না। তারা তাকে কোনো ধরনের সহায়তা করছিলেন না। এই মানুষগুলো এখন সাহাবি। অবিবাহিত। আবার অনেকে ছিলেন যাদের বিয়ে ভেঙে গেছে। বাচ্চাকাচ্চা আছে অনেক।

সাধারণত পরিবারগুলোতে কী হয়? বাচ্চাকাচ্চা থাকে। এরা বড় হয়। বিয়ের বয়স হয়। তখন মা-বাবারা ছেলে-মেয়ের বিয়ের কথা চিন্তা করেন।

কিন্তু একটু বড় পরিসরে চিন্তা করলে গোটা মুসলিম উম্মাহ একটা পরিবার। আল্লাহর রাসূল ﷺ সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে একই দেহের সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা একে নাম দিয়েছেন 'ইখওয়া'। মানে প্রায় রক্ত সম্পর্কে ভ্রাতৃত্ব। আমরা একে অপরের ভাই। আমরা সবাই মিলে বড় একটা পরিবারের মতো। এজন্য আমাদের সমাজে যখন কেউ বিয়েশাদি করতে সমস্যায় পড়ে, সেটা আসলে আমাদেরই সমস্যা। এর দায়ভার সামগ্রিকভাবে আমাদের সকলের কাঁধেই বর্তায়।

যে আয়াতটা নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে—

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

‘তোমাদের মধ্যে অবিবাহিতদের বিয়ে দিয়ে দাও।’ সূরা নূর : ৩২

আল্লাহ এভাবেই শুরু করেছেন। আরবিতে ‘আয়ামা’ শব্দটি নর-নারী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। তবে বেশিরভাগ সময় নারীদের জন্য ব্যবহৃত হয়, আর কম সময় পুরুষদের জন্য। আরবীয় সমাজে শব্দটির ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যেসব পুরুষেরা বিয়ের জন্য সহজে বউ পাচ্ছে না, আরবরা ‘আয়ামা’ শব্দটি তাদের জন্য ব্যবহার করত। কিংবা যেসব পুরুষ যেকোনো কারণেই হোক বিয়েতে রাজি হচ্ছে না, তাদের উৎসাহ দেয়ার জন্য এই শব্দটি তারা বলত।

তবে এই শব্দটি নারীদের বেলাতেই বেশি বলা হতো। যেসব নারীদের তালাক হয়েছে কিন্তু এখনো বিয়ে হয়নি এবং অমুসলিম পরিবার থেকে আসা মুসলিম নারীকেই ‘আয়ামা’ বলা হতো।

এখানে মজার একটা ব্যাপার আছে। খেয়াল করে শুনুন। আল্লাহ কিন্তু এখানে সবার আগে তালাকপ্রাপ্ত নারীদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের দিকে প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। খেয়াল করলে অবাক হয়ে যাবেন, আল্লাহর রাসূলের ﷺ বেশিরভাগ স্ত্রী ছিলেন তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা।

অথচ মানুষ এখন এটাকেই বাঁকা চোখে দেখে। কেউ তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা মেয়েকে বিয়ে করার কথা বললে লোকে তাকে বলে, ‘পাগল নাকি তুমি?’ কী আশ্চর্য, এটাই কিন্তু আমাদের নবিজি ﷺ-এর সুন্নাহ!

সূরা তাহরিমের এক জায়গায় আল্লাহ নবিপত্নীদের হুঁশিয়ার করে বলেছেন, তিনি নবিজি ﷺ-কে তাদের বদলে নতুন স্ত্রী দেবেন। সেই আয়াতে আল্লাহ প্রথমে বলেছেন, ‘সায়্যিবা’ত’, পরে ‘আবকার’। ‘সায়্যিবা’ত’ মানে তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা অকুমারী নারী। আর ‘আবকার’ মানে কুমারী নারী; যাদের আগে কখনো বিয়ে হয়নি।

কুরআনে আল্লাহ যে এত চমৎকারভাবে শব্দ সাজিয়েছেন, সেটা কুরআনের মুফাস্সিরগণ বেশ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন। তারা বলেছেন, যাদের আগেও এক বা একাধিকবার বিয়ে হয়েছিল, আল্লাহ এখানে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ, সমাজের মানুষ এদেরকে সহজেই ভুলে যায়। পেছনে ফেলে রাখে। কিন্তু আমাদের উম্মাহ্‌তে আমরা কাউকে ছুঁড়ে ফেলে রাখি না।

কীভাবে সন্তানদের নামাযের জন্য উৎসাহিত করবেন

আল্লাহর রাসূল ﷺ দশ বছর থেকে ছেলে-মেয়েদের নামায পড়ার জন্য শাসন করতে বলেছেন। আর সাত বছর থেকে নামায পড়ার অভ্যাস করাতে বলেছেন।

নয় বছর বয়স বাচ্চাদের নামায শুরু করার জন্য ভালো সময়। সাত বা আট বছরে হলে তো আরও ভালো। তবে বাচ্চাদের নামায পড়ানোর জন্য কখনো রুঢ় আচরণ করতে যাবেন না, প্রিজ।

আমার বাচ্চাগুলোর মধ্যে কেউ কেউ বেশ ভালোই নামায পড়ে। আবার দু-একজন একটু আলসেমি দেখায়। সে যাহোক, আমরা সবাই একসাথেই নামায আদায় করি। ওদের কেউ আমাকে নামাযে দাঁড়ানো দেখলেও, লেগো নিয়েই খেলতে থাকে। কিন্তু সেজন্য আমি ওদের ধমকাই না। বলি না, ‘অ্যাঁই, এদিকে আসো। নামায পড়ো।’ আগে এমনটা করতাম।

বিষয়টা নিয়ে আমার স্ত্রী আমাকে একবার বলল, ‘তুমি কেন ওদের সাথে এমন করো?’ ওর কথা শুনে ভাবলাম অন্যভাবে বিষয়টা নিয়ে বাচ্চাদের সাথে কাজ করলে কেমন হয়।

এখন আমি ওদের সাথে লেগে নিয়ে খেলি। কথায় কথায় বলি, ‘তুমি যে নামাযে ছিলে না, আমার খুব মন খারাপ লেগেছে। পরেরবার তুমি আমার সাথে নামায পড়বে, ঠিক আছে?’ ওরা তখন বলে, ‘ঠিক আছে বাবা। পরেরবার তোমার সাথে থাকব।’

দেখা যায়, পরেরবার নামাযের সময় হলে, সে নিজেই দৌড়ে এসে আমার পাশে দাঁড়ায়। উৎসাহভরে বলে, ‘বাবা, আমি কিন্তু এখন তোমার পাশেই।’ আমি চোখেমুখে আনন্দ নিয়ে বলি, ‘ইয়ে! চলো, এবার একসাথে নামায আদায় করি।’

এটি খুব আদর-ভালোবাসাময় একটি কাজ হবে। তবে এজন্য বাচ্চাদের সাথে ধৈর্য নিয়ে কাজ করতে হবে।

এমন কোনো নীতি নেই যে, বাচ্চাকাচ্চাকে ধামকি দিয়ে বলবেন, ‘অ্যাই, এখন নামাযের সময়। তোমরা সব কই?’ এরকম করতে থাকলে দেখা যাবে, বাচ্চারা নামাযের সময় হলেই সোফার নিচে লুকাচ্ছে।

‘বাবার জন্য দু-রাকাআত নামায পড়ছি।’ আমি চাই না বাচ্চাদের মধ্যে এমন মনমানসিকতা গড়ে উঠুক। আপনিও চাইবেন না নিশ্চই।

বাচ্চাকাচ্চাদের ভালোবাসতে হবে। উৎসাহ দিয়ে যেতে হবে। ধৈর্য ধরে রাখতে হবে। ওরা যদি কখনো না পড়ে, আলসেমি দেখায় বা তাদের মনে না চায়, তাহলে এটা স্বাভাবিক। ওরা এখনো বাচ্চা। কিশোর না। ওদেরকে সময় দিয়ে বুঝালে, ইনশাআল্লাহ একটা সময় ওদের মধ্যে নামাযের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে।

নামায তো আসলে আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক মজবুত করার জন্য। সম্পর্ক ভালোবেসে হয়। ভয়ে ভয়ে নয়।

আমি দোয়া করি, আপনারা যেন ধৈর্যশীল বাবা-মা হোন।

বাচ্চাদের কাছ থেকে আমরা নিখুঁত আচরণ আশা করতে পারি না। কীভাবে আশা করব। আমরা নিজেরাই তো নিখুঁত নই!

স্ত্রী এবং শ্বশুর-শাশুড়ি

এক

কোনো এক প্রোগ্রাম শেষে একজন মহিলা আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার স্বামী নিয়ে কথা বলা শুরু করল। এটি আমার শোনা সবচেয়ে খারাপ ঘটনা নয়, কিন্তু যথেষ্ট জগাখিচুড়ি পাকানো একটি ঘটনা।

সে বলেছিল, আমার স্বামী যথেষ্ট ধার্মিক। সে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। সবসময় মসজিদে যায়। ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু একই সাথে, সে আমাকে আমার পরিবারের সাথে দেখা করতে নিষেধ করে। আমি যখন তাদের কল করি, যখন তাদের সাথে দেখা করতে যাই, সে এটা পছন্দ করে না। আমাকে খুব কষ্ট করে লুকিয়ে লুকিয়ে আমার মাকে কল করতে হয়, দেখা করতে হয়। যদি আমার স্বামীকে না বলি যে, আমি আমার মায়ের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করি, তাহলে কি আমি গোনাহগার হব? কারণ, আমাকে তো আমার স্বামীর কথা মেনে চলতে হবে।

আমার স্বামী আমাকে বলে, স্ত্রীদের উপর পুরুষের কর্তৃত্ব রয়েছে। তাই সে যা বলে, আমাকে তা-ই করতে হবে। সে হচ্ছে ঘর-বাড়ির আমির। সে বলে, আল্লাহ ও তাঁর দিন মতে, সুন্নাহ ও শরী'আহ মতে, তোমাকে আমার কথা মেনে চলতে হবে, যেহেতু তুমি আমার ঘরে বাস কর। তুমি তোমার পরিবারের সাথে,

ভাই-বোনদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবে না। এছাড়াও এগুলোর সাথে সে তার উপর আরও শর্ত আরোপ করে, আমি চাই না তুমি ঘর থেকে বের হও। বাড়িতে থাক এবং কোথাও যাবে না যতক্ষণ না আমি নিজে তোমাকে নিয়ে যাই।

ঘটনাটি এরকমই ছিল। কাজেই মহিলাটি জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কী এই কারণে গোনাহগার হব? একবার সে বাড়ির পেছনে গিয়েছিল, তার জন্যেও নাকি তাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল! সে হতাশ হয়ে পড়েছে। তার স্বামী সেখানেই ছিল, সে বাথরুমে বা অন্য কোথাও ছিল। আর সেই সুযোগে মহিলাটি আমাকে প্রশ্ন করতে পেরেছিল। কী অদ্ভুত!

দুই

অনেক সময় মানুষ অনেক কিছুই ইসলামের নামে করে। তারা কুরআন-সুন্নাহ, শরী'আর উদ্ধৃতি দেয়। অথচ আমলের দিক দিয়ে বিষয়টা হয় উল্টো। আমার স্ত্রীর সাথে আমার যেমন সম্পর্ক আছে, আমার স্ত্রীর সাথে তেমন তার বাবা-মায়ের, ভাই-বোনের, বান্ধবীর সম্পর্ক আছে। একটা সম্পর্কের অন্য সম্পর্কগুলো ভেঙে দেয়ার কোনো অধিকার আমার নেই।

প্রত্যেকেরই তার নিজস্ব একটি দুনিয়া থাকে। আমরা কোনো মানুষের দাস নই। কোনো মানুষই আসলে অন্য কোনো মানুষের দাস হতে পারে না। আমরা সবাই একমাত্র আল্লাহর দাস।

আমি আমার মায়ের কাছে কিছু জিনিসের জন্য ঋণী। আমার মা আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে কিছু করার জন্য বলতে পারেন না। আমার স্ত্রীও আমার মায়ের বিরুদ্ধে কিছু করার জন্য বলতে পারে না! আবার আমি আমার স্ত্রীকে এমন কিছু করতে বলতে পারি না, যেটি তার বাবা-মায়ের মৌলিক কিছু অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে।

সে কি আমার বাড়িঘর ছেড়ে তাদের সাথে চলে যাচ্ছে? সে তো শুধু একটি কল দিয়েছে! আমি তাকে এটি না করতে বলতে পারি না। কারণ, সে তার বাবা-মায়ের কাছে ঋণী। আর বাবা-মায়ের খোঁজ নেয়াটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। এটি এমন কিছু না, যা সে নিজে থেকে করছে। এটি আল্লাহর হুকুম। তিনি বলেছেন—

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

‘তোমরা মাতা-পিতার সাথে সদাচার করো।’ সূরা বনি ইসরাঈল : ২৩

এখানে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য এই আদেশ। তিনি কিন্তু এটি বলেননি, ‘পুরুষরা! সবসময় পিতা-মাতার সাথে সর্বোত্তম আচরণ কর, আর ‘মহিলারা’ বিয়ে পর্যন্তই। জীবনের বাকি সময় বাবা-মা শুধুই ইতিহাস। মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিলেই হবে, যেমন শুধু প্রতি ঈদে! আল্লাহ আমাদের এমনটি করতে বলেননি।

অন্যভাবে বলা যায়, আপনি অন্যকে দায়দায়িত্ব পালনে নিষেধ করতে পারেন না এবং অন্যের অধিকার থেকেও তাকে বঞ্চিত করতে পারেন না। প্রত্যেকের বিশুদ্ধ বাতাসের অধিকার রয়েছে। আবার কোনো মহিলারা ব্যাপারটিকে উগ্রভাবে গ্রহণ করতে পারে। কোনো মহিলা বলতে পারে, দেখুন আমি উমর (রা.)-এর একটা গল্প শুনেছি। উনি রাস্তায় ঘুরতেন, তাই আমিও রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে যাচ্ছি! আমি ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছি। ওহে, স্বামী! পরে দেখা হবে! অনেকেই এটি করতে পারেন। তাহলে এটি সম্পূর্ণই তাদের সমস্যা। এটি আরেক ধরনের মানসিক সমস্যা। আমাদের দিন এমন নয়। যেমন কেউ বলল, আমি শুধুই বিদ্রোহী হব, কারণ এটা হওয়ার অধিকার আমার আছে।

পরিবার মানে এটি নয় যে, একে অন্যের কাঁধে শুধু নিয়মকানুন চাপাবেন এবং সবসময় একটি হাদিসের উদ্ধৃতি কিংবা আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো কাজ করাবেন। তাহলে কুরআন এবং সুন্নাহর বিষয়ের চাইতেও আপনার নিজের আরও গভীর সমস্যা আছে! আমাদের বৈবাহিক সম্পর্কগুলো তখন আর সুস্থ থাকে না! বিয়ে মানে হচ্ছে আলোচনা, একে অন্যকে ছাড় দেয়া, আমার সঙ্গী সুখী কিনা সেটা সবসময় খেয়াল রাখা। আর যখনই আপনার সঙ্গীকে দিয়ে কিছু করানোর জন্য রীতিমতো দ্বিনকে ব্যবহার করে ব্ল্যাকমেইল করতে হয়, তাহলে এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের নোংরামি। একটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি জগাখিচুড়ি আর কিছুই চিন্তা করতে পারি না। অন্যের উপরে জোর করে নিজের হুকুম চালানোর জন্য কুরআন এবং হাদিসের উদ্ধৃতি দেয়া, যদিও সেটা সেখানে খাপ খায় না।

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

‘তোমরা মাতা-পিতার সাথে সদাচার করো।’ সূরা বনি ইসরাঈল : ২৩

এখানে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য এই আদেশ। তিনি কিন্তু এটি বলেননি, ‘পুরুষরা! সবসময় পিতা-মাতার সাথে সর্বোত্তম আচরণ কর, আর ‘মহিলারা’ বিয়ে পর্যন্তই। জীবনের বাকি সময় বাবা-মা শুধুই ইতিহাস। মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিলেই হবে, যেমন শুধু প্রতি ঈদে! আল্লাহ আমাদের এমনটি করতে বলেননি।

অন্যভাবে বলা যায়, আপনি অন্যকে দায়দায়িত্ব পালনে নিষেধ করতে পারেন না এবং অন্যের অধিকার থেকেও তাকে বঞ্চিত করতে পারেন না। প্রত্যেকের বিশুদ্ধ বাতাসের অধিকার রয়েছে। আবার কোনো মহিলারা ব্যাপারটিকে উগ্রভাবে গ্রহণ করতে পারে। কোনো মহিলা বলতে পারে, দেখুন আমি উমর (রা.)-এর একটা গল্প শুনেছি। উনি রাস্তায় ঘুরতেন, তাই আমিও রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে যাচ্ছি! আমি ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছি। ওহে, স্বামী! পরে দেখা হবে! অনেকেই এটি করতে পারেন। তাহলে এটি সম্পূর্ণই তাদের সমস্যা। এটি আরেক ধরনের মানসিক সমস্যা। আমাদের দিন এমন নয়। যেমন কেউ বলল, আমি শুধুই বিদ্রোহী হব, কারণ এটা হওয়ার অধিকার আমার আছে।

পরিবার মানে এটি নয় যে, একে অন্যের কাঁধে শুধু নিয়মকানুন চাপাবেন এবং সবসময় একটি হাদিসের উদ্ধৃতি কিংবা আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো কাজ করাবেন। তাহলে কুরআন এবং সুন্নাহর বিষয়ের চাইতেও আপনার নিজের আরও গভীর সমস্যা আছে! আমাদের বৈবাহিক সম্পর্কগুলো তখন আর সুস্থ থাকে না! বিয়ে মানে হচ্ছে আলোচনা, একে অন্যকে ছাড় দেয়া, আমার সঙ্গী সুখী কিনা সেটা সবসময় খেয়াল রাখা। আর যখনই আপনার সঙ্গীকে দিয়ে কিছু করানোর জন্য রীতিমতো দ্বিনকে ব্যবহার করে ব্ল্যাকমেইল করতে হয়, তাহলে এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে নোংরামি। একটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি জগাখিচুড়ি আর কিছুই চিন্তা করতে পারি না। অন্যের উপরে জোর করে নিজের হুকুম চালানোর জন্য কুরআন এবং হাদিসের উদ্ধৃতি দেয়া, যদিও সেটা সেখানে খাপ খায় না।

আপনার সন্তানকে সময় দিন

মায়েদেরকে প্রাকৃতিকভাবে আল্লাহ কিছু উপহার দিয়েছেন। যেমন : মাতৃত্বের ব্যাপারটা তাদের মধ্যে অধিকতর সহজাতভাবে আসে। আল্লাহ এটি তাদের দান করেছেন। এ কারণেই তারা মমতাময়ী, কোমল, যত্নবান এবং বেশি উদ্বিগ্ন।

বাবাদেরকে এটার জন্য চেষ্টা করতে হয়। আপনি বাসায় বসে আছেন, আপনার বাচ্চা পড়ে গেল। কে দ্রুত এগিয়ে আসবে? ‘আহা বাবা কী হয়েছে বা আম্মু কী হয়েছে?’ এধরনের কথা বলে মা-ই কিন্তু আগে দৌড়ে আসে।

অন্যদিকে দেখবেন, বাবা তার জায়গাতেই বসে আছে। বসে থেকেই বলে, ‘নিজেই উঠতে পারবে, কিছু হয়নি, কিছু হয়নি। কোনো ব্যাপার না। ধুলা ঝেড়ে ফেল। কিছু হয়নি বাবা। চিন্তার কিছু নেই। সামান্য ব্যথা পেয়েছ।’

এদিকে মা কিন্তু দিশেহারা হয়ে যান। এটি তার মধ্যে স্বভাবজাত। কিন্তু সন্তানকে ইসলামের উপর মানুষ করার জন্য বাবা-মা দুজনকেই সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। আর আমি খেয়াল করে দেখেছি যে, এ জায়গাটিতেই আমরা অনেক পিছিয়ে।

আমরা যদি আমাদের সন্তানদেরকে ইসলামের মধ্যে বড় করতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হলো, আমাদেরকে তাদের বন্ধু হতে হবে।

এজন্য পরিশ্রম করতে হবে। কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আপনাদের নিজেদেরকে বদলাতে হবে। নিজের জন্য নয়, আপনার সন্তানের জন্য। আপনি যখন বাসায় আসেন, তখন আপনার বাচ্চারা আপনার সাথে খেলতে চায়। ‘আব্বা, আমাকে কোলে তুলে নাও, আমাকে ঘোরাও, এটা করো, ওটা করো। আর একটুখানি করেই আপনি এমন কাহিল হয়ে যাওয়ার ভান করেন। ‘আব্বাকে এখন একটু গুতে হবে, একটু অপেক্ষা করো।’ এটা ঠিক না।

বাচ্চাদের নিয়ে পাহাড়ে উঠুন, তাদের সাথে খেলাধুলা করুন। বাড়ির আঙিনায় দৌড়াদৌড়ি করুন। তাকে সময় দিন। সন্তান আর আপনার মাঝের সংকোচ দূর করার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। তা না হলে, সে যেকোনো বিষয় নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে পারবে না। আমি এটা আপনাদের এ কারণে বলছি যে, যখন তারা একটি নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছাবে, তখনো কথা বলার মতো কারও সেই প্রয়োজনটা থেকেই যাবে। সেই মানুষটি আপনিই হয়ে যান না। বাইরের ছেলেপেলে, বড় ভাই, গালফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড লাগবে কেন? আপনিই হয়ে যান তার কাছের মানুষ।

হঠাৎ করে নিশ্চই আপনি আবিষ্কার করতে চান না যে, আপনার বাচ্চা যেন অন্য কেউ। অর্থাৎ অচেনা একজন। আপনি আলাপকালে হয়তো একসময় বুঝতে পারলেন, এই সন্তানকে আপনি চেনেন না। এত বছর এক ছাদের নিচে বসবাস করার পরও কীভাবে এমনটা ঘটল, সেটা ভেবে আপনি নিজেই অবাক।

‘ও, এটা তো কবেই ঘটে গেছে বাবা। কবেই ঘটে গেছে।’ শুধু আপনিই জানতেন না। আপনি ছিলেন মহাব্যস্ত। আপনার সময় ছিল না। আপনি জানতে চাননি বা পারেননি।

আপনাকে আপনার সন্তানদের জন্য বিশেষ সময় তৈরি করে নিতে হবে। এটা হবে শুধু তাদের সময়। যদি আপনার অনেক সন্তান থাকে, তাহলে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, প্রতিটা সন্তানই যেন আলাদা আলাদা মনোযোগ আর সময় পায়। অন্য কারও কাছ থেকে নয়, শুধু আপনার কাছ থেকে। কোনো খেলনা নয়, কোনো গ্যাজেট নয়, কোনো কিছুই নয়, শুধুমাত্র আপনি। এটা করতেই হবে। ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

পুরুষেরা জান্নাতে হ্র পাবে, নারীরা কী পাবে

টিটকারি করে অনেককে বলতে শুনবেন, ‘কী, তোমাদের জন্য জান্নাতে নাকি ৭০টা করে পরি থাকবে? তোমরা নাকি এজন্য মানুষ মারো?’

জান্নাতে হ্র পাওয়া নিয়ে লুকোছাপা বা লজ্জার কিছু নেই। আল্লাহ কুরআনে এই ব্যাপারে নিজেই বলেছেন। আমি যখন ইসলামের ব্যাপারে জানতে শুরু করলাম, তখন কিছু বিষয় ছিল যা আমি একা একা বের করতে পারিনি। তার মধ্যে একটা ছিল, পুরুষেরা হ্র পাবে, নারীরা কী পাবে?

আমার মাথায়ও কিন্তু এই প্রশ্ন এসেছিল। কেন এসব রোমাঞ্চকর পুরস্কার, সুন্দরী স্ত্রী, এই ধরনের জিনিসগুলোর কথা কুরআনে বলা হয়েছে। আর শুধু তাই না, এগুলোর বর্ণনাও খুব বিস্তারিতভাবে এসেছে।

একবার ড. ইসরার আহমেদ রাহিমাহুল্লাহর সাথে খুবই অল্প সময়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে কথা বলেছিলাম। তিনি বেশ রাশভারী চরিত্রের মানুষ ছিলেন। অবশ্য এখন তিনি মারা গেছেন।

তখন তিনি নিউইয়র্কে ছিলেন। আমি উনাকে প্রথমবারের মতো উনার মাথার বিশাল টুপিটা ছাড়া দেখেছিলাম। তিনি বেশ আরাম করে বসে ছিলেন। উনার পাশে আরেক আংকেলও ছিলেন। উনার চুলগুলো উল্টো করে আঁচড়ানো।

আর উনি বসে কীসের চিন্তায় যেন মগ্ন ছিলেন। আমি উনাকে দেখে বেশ ভয়ই পাচ্ছিলাম। তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। বেশ একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। আমার মনে অনেকগুলো প্রশ্ন খুটখুট করছিল। একপর্যায়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ কেন কুরআনে হ্রের ব্যাপারে বলেছেন?’

তিনি আমাকে তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছু কথা বলেছিলেন, যা আমার কাছে বেশ যৌক্তিক মনে হয়েছে। তিনি এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়াও আরেকজন আলিম, তার সাথেও আমার নিউইয়র্কেই দেখা হয়েছিল, তিনি আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। যাহোক, সেসব ব্যাখ্যাতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি জানি না, আপনারা সন্তুষ্ট হবেন কিনা। কিন্তু আমি নিশ্চিত আমি সন্তুষ্ট।

তিনি বলেছেন, আমাদের সমাজে ছেলেরা সবসময় আশেপাশে অশ্লীলতা দেখে। নবিজি ﷺ উনার উম্মাহর জন্য এই বেহায়াপনা/অশ্লীলতা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। আর আমাদের ধর্ম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ছেলে-মেয়েদের মেলামেশার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি রক্ষণশীল ও নিয়ন্ত্রিত। সেটা ছেলে-মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে দুই বিপরীত লিঙ্গের মাঝে কী ধরনের কথোপকথন হবে, কোনো নন-মাহরামের সাথে একা থাকলে কী হবে, কোনো মজলিশে কী ধরনের আয়োজন হবে, ছেলে-মেয়ের জন্য সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

সূরা নূরে তো এমনকি কেউ আপনার বাড়িতে আসলে কীভাবে ঢুকতে হবে, সেটা পর্যন্ত শেখানো হয়েছে। কেউ দরজা নক করল আর ঢুকে পড়ল, এরকম হবে না। মহিলাদের আগে নিজেদের ঠিকঠাক করার সুযোগ দিন। আলাদা রুমে যেতে দিন... ইত্যাদি। এত বিস্তারিত নিয়মকানুন বর্ণনা করা হয়েছে যে, দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে যখন আপনার সন্তানও এমনকি আপনার রুমে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদেরকে বাইরে থেকে নক করতে হবে। বাসার মাঝেও ছেলে-মেয়েদের মেলামেশার জন্য কিছু নিয়মাবলি আছে। এটা বেশ চমৎকার একটা ব্যাপার। আপনারা হয়তো এ বিষয়টাও জানেন যে, ছেলে-মেয়েরা একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর গায়ে দেবার কাঁথাও শেয়ার করতে পারে না। আমাদের ধর্মে এরকম অনেকগুলো অসাধারণ বিধিনিষেধ ও সতর্কতা রয়েছে। এটা ভেবে দেখার মতো বিষয়।

আর এটার ঠিক উল্টো বিবরণ হচ্ছে জান্নাতের। সেখানে যুবক ছেলেরা সুন্দরী স্ত্রী পাবে। সেখানে কোনো কিছুতে কোনো বাধা থাকবে না। সে যা মন চাইবে তাই পাবে। আর সেই স্ত্রীদের বিস্তারিত বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। ড. ইসরার আহমেদ ঠিকই বলেছিলেন, কোনো ছেলে যখন কলেজে যায়, চোখ নিচু রাখে। সেখানে খুবই কম কাপড় পরিহিত মেয়েরা থাকে। মেয়েটি বলে, হেই, কেমন আছ? কিন্তু সেই ছেলেটি ফিরে তাকায় না। সে বলে, আল্লাহ আমার জন্য উত্তম প্রতিদান রেখেছেন। সে নিজেকে এর থেকে বাঁচিয়ে চলে। যদিও তার উত্তেজিত হরমোনগুলো তাকে বলে, একটু দেখিই না। তার চোখগুলো তার কাছে ভিক্ষা চায় তাকানোর জন্য। তার কৌতূহল তাকে তাকাতে উৎসাহ দেয়। সেখানে সুযোগ, স্বাধীনতা, যৌবন, তেজ, সৌন্দর্য সবকিছু থাকে তার জন্য। কিন্তু সে বলে আমি ফিরে তাকাব না, আমি এটা করব না। এক্ষেত্রে আমি একটি ভুল পদক্ষেপও নিব না। আল্লাহর কাছে আমার জন্য উত্তম প্রতিদান আছে। তার সব বন্ধু সেই ভুল পথে যায়, কিন্তু সে যায় না।

এটা শুধু আল্লাহর অসাধারণ ন্যায়বিচার যে, জান্নাতে তিনি সেই পানীয় প্রদান করেন, যা এখানে আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। সে আনন্দগুলো প্রদান করেন, যেগুলো থেকে আমরা নিজেদের এই দুনিয়ায় নিবৃত্ত রাখি। তিনি বলেন, দেখো, তুমি কীভাবে বিরত রেখেছিলে নিজেকে। এই নাও, এখন উপভোগ করো। আমি তোমার জন্য দরজা অব্যাহত করে দিলাম। তো এগুলো হচ্ছে আসলে সেই বাধা-নিষেধের বিপরীত, যেগুলো আল্লাহ এই পৃথিবীতে দিয়েছিলেন। এই জন্য এখানে শালীনতা এত জরুরি। আপনারা জান্নাতে আনন্দ-ফুর্তি করতে চান? তাহলে এখানে নিজের শালীনতা বজায় রাখুন।

আল্লাহ জানেন আমাদের আকাঙ্ক্ষা আছে। তিনি আমাদের চিন্তাগুলোকেও অস্বীকার করেন না। তিনি জানেন ওয়াসওয়াসা সবসময় আমাদের মনে আসে। সাইকোলজিতে পাবেন, একজন সাধারণ মানুষ এসব বিষয়ে দিনে কতবার চিন্তা করে। আপনারা এটা অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনারা জানেন, এটা মানুষের মাঝে আছেই। মানুষের ভেতরে এগুলো আল্লাহই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

‘মানুষের কাছে সুশোভিত করা হয়েছে নারী।’ সূরা আলে-ইমরান : ১৪

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ যখন পুরুষদের জন্য এমন পুরস্কারের বিবরণ দিয়েছেন, তাহলে নারীদের জন্য কেন দেননি? কোনো রাখটাক না রেখে যদি বলেন, তাহলে প্রশ্নটা এরকম যে, পুরুষরা একাধিক স্ত্রী পায় কিন্তু তারা কেন একাধিক স্বামী পায় না?

আমার এক অভিজ্ঞতার কথা আপনাদেরকে বলি। একবার এক সানডে স্কুলে কিছু কিশোর-কিশোরীকে নিয়ে, আমাকে একটি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করতে বলা হয়েছিল। তাদের উভয়কেই একই প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, যদি তোমাকে এমন কিছু চাইতে বলা হয়, যেটা তোমরা পাবে। যতবার ইচ্ছা চাও পাবে, কোনো বাধা থাকবে না। কেও জানতে পারবে না, তোমরা কোনো সমস্যার সম্মুখীনও হবে না, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না। তোমরা যা চাও এখনি পাবে, সেটা কী হবে? কী চাইবে?

এই প্রশ্নটা ১০০ কিশোর ও ১০০ কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। উম্মাহর ছেলেদের মাঝে যেন ইজমা আছে এ ব্যাপারে! বানান ভুল বাদে সেখানে কোনো বৈচিত্র নেই। উত্তরে কোনো বৈচিত্র নেই।

মজার উত্তরগুলো এসেছিল মেয়েদের কাছ থেকে। আরেকটা ব্যাপার হলো, ছেলেদের উত্তর তা-ই ছিল, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন—

‘মানুষের কাছে সুশোভিত করা হয়েছে নারী।’ সূরা আলে-ইমরান : ১৪

পুরুষদের মাঝে নারীদের আকাঙ্ক্ষা সহজাত। আল্লাহ পুরুষদের মাঝে এই আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন। এটা যেন তারই প্রমাণ।

মেয়েরা বেশ মজার উত্তর দিল। একজন বলে, ‘আমাকে কি আরও ৫ মিনিট সময় দেয়া যাবে?’ অনেকে আবার তাদের পেপারটা জমা দেয়ার সময় বলে, ‘না, না! আমি কি আমার পেপারটা ফেরত নিতে পারি, কারণ আমার মাথায় অন্য উত্তর এসেছে?’ কেউ কেউ একবার কেটে লিখে, তারপর আবার কেটে লিখে। অনেকে একাধিক উত্তর দিয়েছিল কারণ, তাদের একটা উত্তরে হবে না। আমার কাছে প্রিয় উত্তরটি ছিল, ‘এটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।’ অনেকজনকেই এরকমটা লিখতে দেখলাম।

মেয়েদের কেউ লিখেছে, আমি শুধু আমার মায়ের সাথে থাকতে চাই। আবার কেউ বলেছে পনি (ক্ষুদ্রকায় ঘোড়া)। যাহোক, সব ধরনের উত্তর ছিল।

আবার কেউ লিখেছে, আমার ভালোবাসার পুরুষের সাথে থাকতে চাই। আমি সব ধরনের উত্তর পেয়েছিলাম। কোনো নির্দিষ্ট একটা উত্তর কিন্তু ছিল না।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের পুরুষদের আবেগকে একমুখী বানিয়েছেন। আমরা শুধু একভাবেই চিন্তা করি। সাধারণভাবে বুঝাতে চাইছি যে, অন্যরকম কিছু পুরুষও আছে যারা নারীদের ভালোবাসার থেকেও বইকে বেশি ভালোবাসে, এরকমও আছে। কিন্তু আমাদের বেশির ভাগকেই আল্লাহ একই চিন্তাধারার করেছেন এবং আল্লাহ এখানে সেটার কথাই উল্লেখ করেছেন। ঠিক কিনা? আমি বোনদের খুশি করার জন্য বলছি না। এটা আমার নিজের বিশ্বাস। আর আল্লাহ যা বলেছেন, আমি সেটা ব্যাখ্যা করতে লজ্জিতও না। আল্লাহর কালামের ব্যাপারে আমাদের সৎ থাকতে হবে। কাউকে খুশি বা বেজার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমি আল্লাহর কালাম সম্পর্কে যতটুকু বুঝেছি, সেটাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি।

আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে যে, জান্নাতে নারীদের জন্য পুরস্কার আরও বৈচিত্র্যময়, অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। আমি আপনাদের জন্য একটা আরবি বাক্য শেয়ার করব, ‘রুব্বা সুকুতিন আদালু মিন কালামিন’- অর্থাৎ নীরবতা অনেক সময় কথা বলার থেকেও বেশি বুঝায়। আল্লাহ তায়ালা নীরব আছেন এই ব্যাপারে কারণ, এই নয় যে পুরস্কার নেই বরং তা ভাষায় অবর্ণনীয়। আর এই বিষয়টি অন্য ক্ষেত্রেও আছে কুরআনে। বিভিন্ন আমলের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার রয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু আমল আল্লাহর কাছে এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে, সেই আমলগুলোর পুরস্কার ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তো ঐসব আমলের জন্য আল্লাহ কী বললেন? ‘ফা আজরুহু আলাল্লাহ’- ‘এগুলোর পুরস্কার আল্লাহর কাছে’। এগুলো আল্লাহ দেখবেন। এগুলো ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, তিনি খেয়াল রাখবেন, এই দায়িত্ব উনার। প্রসঙ্গক্রমে আরেকটা কথা বলছি। এই ধরনের অবর্ণনীয় পুরস্কার তাদের জন্যও আছে, যারা প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্যদের মাফ করে দেয়। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাফ করে দিলে, সে এই অবর্ণনীয় পুরস্কার পাবে।

নারীদের পুরস্কারের কথা বলা হয়নি, তার মানে এই নয় যে তাদের কোনো পুরস্কার দেয়া হবে না। বরং, এটা ছেড়ে দেয়া হয়েছে কল্পনার উপর। প্রসঙ্গক্রমে বলি, কোনো মুসলিম নারী-পুরুষের এমনটা ভাবা উচিত না যে, তারা অল্প প্রতিদান পাবে। জান্নাতে যান, আপনারা হতাশ হবেন না।

‘পাওয়ার পর যদি পছন্দ না হয়?’ আমি শতভাগ গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, আপনাদের পছন্দ হবে। এর প্রমাণ কী আপনারা পছন্দ করবেন? সূরা ফুসসিলাতের ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানবজাতিকে বলেন—

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ

‘সেখানে তোমরা যা চাইবে, তা-ই পাবে। এটা সবার জন্য উন্মুক্ত।’

নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই। যা চাইবেন, সেখানে তা-ই থাকবে এবং তারপর আরও কিছু, তারপর আরও বেশি কিছু।

তারপর আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ

অর্থাৎ, তোমরা যা দাবি করবে, তা-ও সেখানে পাবে। মানে একবার একটা কিছু বলার পর পরে অন্য কিছু মাথায় আসতে পারে। আপনি অন্য কিছু অর্ডার করতে চান। দাঁড়াও, দাঁড়াও... আমি ওটাও চাই। কোনো সমস্যা নেই, আপনি সেটাও পাবেন। এটা এমন না যে, একবার অর্ডার করার পর আর করা যাবে না। আপনাকে সেখানে থেমে যেতে হবে না।

আপনি আপনার মন পরিবর্তন করতে পারবেন। আপনি অন্য কিছু অর্ডার করতে পারবেন, অসাধারণ! জান্নাতের সেই দরজা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই খোলা।

ইসলামে স্ত্রীর অধিকার

গাফ্ ট্যুরে থাকাকালীন একবার এক ইমেইল পেলাম।

‘আমি একজন অমুসলিম। কয়েতে অল্প কয়েক বছর ধরে কাজ করছি। আমার অফিসের এক ধার্মিক মুসলিম কলিগকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাকে বিয়েও করতে চাচ্ছিলাম। যে কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলাম।

তাই আমি ইসলাম সম্পর্কে আরও জানতে চাচ্ছিলাম। আমি যাকে পছন্দ করেছি, তিনি একজন পাকিস্তানি। তার সংস্কৃতি আরও ভালোভাবে জানার জন্যে, আমি পাকিস্তানি এক মহিলা কলিগের সাথে আলাপ করেছি। আমি ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্যে কুরআন পড়ছি। এখানে একজন স্ত্রীকে যে অধিকার দেয়া হয়েছে, তা খুবই হৃদয়গ্রাহী এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু যখন আমি আমার মেয়ে বন্ধুটির জীবনের দিকে তাকাই, তখন অন্য ধরনের চিত্র দেখি। তাকে তার শ্বশুরবাড়ির জন্যে অনেক কিছু করতে হয়। আর তার স্বামীও তাকে জোর করে, সে যেন তার শাশুড়ির সেবা-যত্ন করে। তার শাশুড়ি তাকে অনেক যন্ত্রণা দেয়। তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়। এদিকে তার ননদেরা তাকে সবসময় কাজের মেয়ের মতো খাটিয়ে নেয়। তার স্বামীও এ ব্যাপারে অনেক কঠোর। আমি এক্ষেত্রে অনেক অবিচার দেখতে পাই। তিনি তাকে ভয় দেখান যে, তার কথা না গুনলে তিনি স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যাবেন। এটাই যদি ইসলামের আসল রূপ হয়, তাহলে আমি ঠিক নিশ্চিত না আমি মুসলিম হব কিনা। এ ব্যাপারে আপনার উপদেশ কী?’

এ ধরনের প্রশ্ন আমার কাছে নতুন না। নারীর অধিকার সম্পর্কে জানতে চেয়ে, বিশেষ করে শৃঙ্খরবাড়িতে তাদের অধিকার কী, সে সম্পর্কে জানতে চেয়ে অনেকেই আমাকে এ ধরনের প্রশ্ন করেন।

বিষয়টা বেশ জটিল। আমি এ ব্যাপারে কিছু মৌলিক ধারণা সবার সাথে শেয়ার করছি। প্রথমত, এমন প্রশ্ন করার জন্য সেই বোনকে ধন্যবাদ। এটা শুধু আপনাকে না, আপনার মতো অগণিত নারীর উপকার করবে, ইনশাআল্লাহ।

ইসলামে যেকোনো সম্পর্ক কিছু অধিকার আর কর্তব্যের ভিত্তিতে স্থাপিত। একজন পুরুষ হিসেবে আমার স্ত্রীর প্রতি আমার কিছু কর্তব্য রয়েছে। ঠিক যেমন আমার প্রতি তার কিছু দায়িত্ব রয়েছে। আর বাবা-মায়ের প্রতি আমার কিছু দায়িত্ব রয়েছে, ঠিক যেমন আমার প্রতি তাদেরও দায়িত্ব আছে। তাদের কাছে আমার কিছু অধিকার আছে।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, আপনি যেকোনো একটি সম্পর্কের অধিকার আদায় করতে গিয়ে অন্য আরেকটি সম্পর্কের অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারেন না। কথা হলো, আপনি কীভাবে সব অধিকারের সমন্বয় ঘটাবেন?

একজন ছেলে-সন্তান হিসেবে আমাকে আমার বাবা-মায়ের প্রতি অনুগত হতে হবে, তাদের সম্মান দেখাতে হবে, দয়া দেখাতে হবে। তারা আমার কাছে যা চান, তা পূরণ করতে হবে। যদি না তারা আমাকে ইসলামের বাইরে কিছু করতে আদেশ দেয়, কিংবা আল্লাহকে অমান্য করতে আদেশ দেয়। এটা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে তাদের অনুগত থাকতে আমার কোনো সমস্যা থাকা উচিত নয়।

অন্যদিকে, আমার স্ত্রীকেও তাদের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে, সাধারণ শিষ্টাচার বা আদব দেখাতে হবে। কিন্তু তাকে তাদের অনুগত হয়ে চলতে হবে না। আর স্বামী হিসেবে আমি যদি তার কাছে আমার বাবা-মায়ের সেবা দাবি করি, তাহলে আমি তার প্রতি অবিচার করছি। স্ত্রীকে তার নিজের বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্যশীল হতে হয়, তার তো নিজের অভিভাবক রয়েছে। এরা তার নিজের অভিভাবক নয়, আপনার অভিভাবক। রক্তের বন্ধনে যে সম্পর্ক হয় আর বিয়ের বন্ধনে সে সম্পর্ক হয়, তা মোটেই এক নয়। কিছু মানুষ জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু আপনাকে তো আপনার স্বামীর আনুগত্য করতে হবে, সে যা-ই করতে বলুক না কেন!' এটাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমরা কোনো মানুষেরই এতটা অনুগত নই যে, 'সে যা-ই করতে বলুক না কেন' তাই করতে হবে।

বাবা-মা আমাকে যা যা বলবে আমি তার সব কিছুই অনুগত্য করতে পারব না। আমার বাবা যদি আমাকে স্টুডেন্ট লোন নিতে বলতেন, যেখানে সুদের কারবার আছে, আমি তা করতাম না। আমি এটা করতে পারি না। এতে আল্লাহর অবাধ্য হতে হবে। আমি এমনটা করব না। আর মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, আপনাকে আদব বজায় রেখে আপনার বাবা-মায়ের অবাধ্য হতে হবে। কারণ, তারা অযৌক্তিক কাজ করতে বলছে।

এরকমও হতে পারে আপনার বাবা আপনাকে বলছেন লোন নিতে, যা সুদের ভিত্তিতে নেয়া হচ্ছে না। কিন্তু তিনি আপনাকে এমন ব্যবসায় যেতে বলছেন, যার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত যে আপনার বেশ ক্ষতি হবে। আপনি নিশ্চিত জানেন যে, এই ব্যবসা কোনোভাবেই চলবে না। অথচ তিনি চাইছেন আপনি আপনার জীবনের সব পুঁজি সেই ব্যবসায় ঢেলে দিন। সেই মুহূর্তে আপনার বাবার কথা না শোনা তার অবাধ্যতা নয়।

আসলে অভিভাবকের অনুগত থাকার অর্থ যৌক্তিকতার উদ্দেশ্যে থাকা নয়। অবশ্যই আমরা যখন তাদের অবাধ্য হই, আমরা কখনো, কোনোভাবেই তাদেরকে অসম্মান করে তা করি না। হ্যাঁ, এটাও ঠিক যে তাদের অনেক আদেশ আমাদের জন্যে যদি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, বা আমাদের প্রতি যদি তারা কঠোরও হন, সেক্ষেত্রেও তাদের অনুগত্য করতে হবে। যদি তারা অযৌক্তিক কিছু করতে বলেন কিংবা এমন কিছু যা অন্যকে সমস্যার সম্মুখীন করে তোলে, তা আমি করতে পারি না। যেমন : আমি যদি সব পুঁজি দিয়ে তাদের কথামতো এমন ব্যবসায় নেমে পড়ি যেটা সফল হবে না, তাতে করে আমি তাদের ইচ্ছামতো কাজ করেছি ঠিকই কিন্তু আমি আমার বাচ্চাদের কষ্টের মুখে ফেলে দিয়েছি। আমার স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছি এবং যারা আমার উপর নির্ভর করে আছে তাদের সকলকে সমস্যায় ফেলছি। আমি এমন কাজ করতে পারি না। তারা আমাকে যা খুশি তা করতে বলতে পারেন কিন্তু তারা আমাকে দিয়ে অন্য কারও উপর অত্যাচার করাতে পারেন না। এভাবে অধিকার আদায় করা যায় না।

কিছু পরিবার আছে যারা স্বামীকে জোর করেন কেবল একটা একাউন্ট রাখতে। আর তার অভিভাবকেরা হলেন, সেই একাউন্টের কো-সাইডার। এদিকে স্ত্রী প্রতি সপ্তাহে হয়তো দু-চার হাজার টাকা করে পাচ্ছেন। এভাবে জীবনযাপন করলেও চলবে না। আপনি এটা করতে পারেন না।

আপনি আপনার স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন, আপনি তার ওয়ালি হয়ে তাকে তার বাবার কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। আপনাকে এখন তার প্রতি সেসব কর্তব্য পালন করতে হবে, যা তার প্রতি তার বাবা করে এসেছেন। কিন্তু এখানে ঘরে সকলে তার সাথে দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষের মতো আচরণ করে! যেন সে শ্বশুর-শাশুড়ির কাজের লোক কিংবা আপনার বোন অথবা অন্য কারও। এটা হবে চরম প্রতারণা। এটা এমন এক বিষয়, যার ব্যাপারে আপনাকে এবং আমাকে শেষ বিচারের দিন জিজ্ঞেস করা হবে।

অন্যদিকে, আছে আরেক চরমপন্থীরা। একদিকে, আমরা দেখি বউকে বাড়ির কাজের মেয়ে বানিয়ে ফেলা হয়েছে, যা চরম অবমাননাকর এবং উদ্ভট। কোনোভাবেই যা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। আর অন্যদিকে, আছে এমন সব স্ত্রী অথবা স্বামী যারা তাদের শ্বশুরপক্ষের সকলের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ। যেমন : তারা বলেন, তোমার বাবার বাড়ির কারও সাথে আমি সম্পর্ক রাখতে চাই না। তাদের মুখও দেখতে চাই না। আমি চাই না, তারা আমাদের বাসায় আসুক। আমি চাই না তুমি তোমার মায়ের বাসায় যাও, তার সাথে কথা বল, আমি তাকে ঘৃণা করি, তাকে আমি সহ্য করতে পারি না ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে স্বামীর সাথে তার পরিবারের ভীষণ দূরত্ব সৃষ্টি করা হয়। এটাও এক ধরনের চরমপন্থা। এটাও অবিচার।

তারা আপনার স্বামীর অভিভাবক। আপনার স্বামীর উপর তাদের অধিকার রয়েছে। তারা যেন তাদের নাতি-নাতনিকে দেখতে আসতে পারে, তারা যেন আপনার বাসায় ঝগড়া সৃষ্টি হবে— এমন দুশ্চিন্তা করা ছাড়াই আসতে পারে। অথবা তাদের দেখলে মুখটা কালো করে বসে থাকতে পারেন না।

এতে আপনি আপনার দিক থেকে আপনার স্বামীর উপর অত্যাচার করছেন। কারণ, তার প্রতি ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে আপনার অন্তত তার পরিবারের সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করা উচিত। ভদ্রতা এবং শ্রদ্ধা করা এটুকুই তো! আপনার স্বামী আপনার উপর এগুলো চাপিয়ে দিতে পারেন না ঠিকই, কিন্তু এই আচরণ তো আপনার নিজ থেকেই আসা উচিত। আর এগুলো তো এমন বিষয়, যা আপনাদের ঘোর কাটানোর জন্যে বলছি, এই সৌজন্যমূলক আচরণগুলো তো সব মুসলিমই অন্য মুসলিমের সাথে করে থাকে।

হ্যাঁ, অনেক সময় জটিল অবস্থারও সৃষ্টি হয়! বিশেষ করে যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে। সত্যিই, সেগুলো খুব মারাত্মক পরিস্থিতিতে চলে যায়।

অন্যান্য অনেক কালচারের মধ্যে, বিশেষ করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারতে আমরা সকলে মিলে একছাদে থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করি। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিবারের খরচাপাতি বাবা-মা চালাচ্ছেন। ভালো স্ত্রী হিসেবে পরিচয় পেতে তখন বউকে এই করতে হবে, সেই করতে হবে, এই নীতি বেশিরভাগ পরিবারের ক্ষেত্রেই কাজে দেয় না। আর যদি কাজে না দেয় বোনেরা, আমি বলছি না আপনারা এক্ষেত্রে বিয়ে ভেঙে ফেলুন, তবে এটা বাস্তবিকই আলোচনার দাবি রাখে। কারণ, এই পন্থা ইসলামিক নয়। যদিও আপনারা পুরো পরিবার মিলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তকে ইসলামের আড়ালে লুকিয়ে রেখে ভাববেন না যে, ইসলাম আপনার কাছে এটাই চায়। ইসলাম আপনার কাছে এমন কিছু প্রত্যাশা করেনি; এটা আপনার পরিবার চেয়েছে। কিছু ব্যাপারে আপনাকে পরিবারের সকলকে সঙ্গে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

‘তোমরা যেসব নিয়ামত ভোগ করো, সে ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে।’ সূরা আত-তাকাহুর : ৮

আমার স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, বাবা-মা, এরা সবাই আল্লাহর নিয়ামত যা আমি উপভোগ করি। তাই আমার উচিত তাদের অধিকার আদায় করা।

আমি প্রার্থনা করছি, যারা ভাবেন বউকে দিয়ে ঝিয়ের কাজ করানোর বিষয়গুলো ইসলামের আদেশ, এই কথাগুলো যেন এসব ভ্রান্ত ধারণাকে কিছুটা হলেও কমিয়ে দেয়। ইসলাম এ ব্যাপারে এমন কিছু বলেনি। এটা কেবলই স্থানীয় সংস্কৃতির অপচর্চা। কুরআন একে সমর্থন করে না, রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহও না।

বিয়ে আর ডেটিং কি এক

বিয়ের মাধ্যমে নিজের লজ্জাহীন সংরক্ষণ রাখার বিষয়টা নিয়ে একটু ভাবা যাক।

বর্তমান সময়ে একজন যুবক বিয়ে করার পূর্বে কী করছে? ধরুন, সে এদিক-সেদিক কিছু মুভি দেখেছে; মানে তাওবা করে ধার্মিক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আরকি। আর এসব মুভির মাধ্যমে তার মধ্যে ভালোবাসা আর বিয়ে নিয়ে কিছু ধারণা গড়ে উঠছে। প্রায়ই ভাইয়েরা আমার কাছে এসে বলে, ‘ভাই, আমার বিয়ে করা খুবই জরুরি।’ তাদের ভেতর এমন একটা ধারণা হয়েছে যে, একবার বিয়ে হয়ে গেলেই যাবতীয় লালসা নিমিষেই উধাও হয়ে যাবে। জীবন শান্তিতে পূর্ণ হবে, আমরা একসাথে কুরআন পড়ব ইত্যাদি ইত্যাদি ফ্যান্টাসি সব চিন্তায় ভেসে বেড়ান তারা। তাদের মনে বিয়ে নিয়ে অতিরঞ্জিত একটি ধারণা গড়ে উঠে।

আপনারা যারা বিবাহিত, তারা হয়তো ভাবছেন ‘এইসব কী বলছে?’ কারণ, আপনারা হয়তো, এসব অনুভূতির কথা ভুলেই গিয়েছেন। বিবাহিত জীবনে মাঝে মাঝেই আমাদের কঠিন কিছু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। কিন্তু বিয়ে নিয়ে আধুনিক সময়ে নারী আর পুরুষের মাঝে ভালোবাসা, নির্ভরশীলতা বা বোঝাপড়ার যে ধারণা দেয়া হয়, তার সাথে ডেটিং-এর ধারণার কোনো পার্থক্য নেই। ডেটিং মানে যত দিন সম্ভব আনন্দ করা। তারপর যখন কোনো কঠিন সময় আসে, আপনি সব ছেড়েছুড়ে দূরে সরে যান। এটাই ডেটিং, ঠিক কিনা?

তাই আমরা যখন বিয়ে নিয়ে চিন্তা করি, ভাইয়েরা, এমনকি বোনেরাও যখন বিয়ে নিয়ে চিন্তা করেন, তারা বিয়েকে ডেটিং-এর মতোই ভাবেন।

কিন্তু আপনারা নিশ্চয় জানেন, বিয়ে আসলে ডেটিং-এর চেয়েও অনেক বড় কিছু। পরিবারের পেছনে টাকা পয়সা খরচ, ঘরের কাজকর্ম, আরেকজন মানুষের সাথে থাকতে শেখা, মাঝে মাঝে এগুলো খুবই কঠিন মনে হয়। আপনি আপনার মতো করতে চান, সে তার মতো করতে চায়। কখনো তোয়ালে বাঁকাভাবে রাখা নিয়ে বা ব্রাশ ভুল জায়গায় রাখা নিয়ে অথবা হয়তো কফিতে চিনি একটু বেশি হওয়া নিয়ে আস্তে আস্তে ক্ষোভ জমা হয়। প্রথম প্রথম ভালোবাসার কারণে হয়তো আপনি কিছু বলেন না। ভাবেন, নিজেই সামলাতে পারবেন। কিন্তু কয়েক বছর পর এতকিছু জমা হয়ে যায় যে আপনি বলেন, ‘আবার চিনি বেশি?’ পাশের বাড়ি থেকেও আপনার গলা শোনা যায়।

কিন্তু ডেটিং-এ এমন কিছু হয় না। কারণ, আপনার যখন একজন মেয়েকে আর ভালো লাগে না, তখন আপনি আরেকজনকে জোগাড় করে নেন। অথবা সেই মেয়ের যখন মন উঠে যায় সে বলে, ‘আমি তোমার গন্ধও পেতে চাই না, আমি গেলাম।’ মানে কিছু হলেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া। মানে সব ছেড়ে দূরে সরে যাওয়া।

কিন্তু বিয়ে একটি শক্ত প্রতিজ্ঞা। জীবনভর একটা প্রতিশ্রুতি। কুরআনেও এই ব্যাপারে খুব গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহিত মহিলাকে কুরআনে আলমুহসানাত এবং পুরুষকে আলমুহসিনীন বলা হয়েছে।

আরবিতে ‘ইহসান’ মানে হলো কাউকে নিরাপদ দুর্গের মধ্যে রাখা। অনেকটা মিলিটারি ক্যাম্পের মতো। উদাহরণটা এমন যে, বাইরে শত্রু আছে। আর তাই যে মিলিটারি ক্যাম্পের ভিতরে আছে সে নিরাপদ। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ‘নারীরা যেন নিরাপদ প্রাচীরের মধ্যে আছে; আর কে তাদের সুরক্ষা দিচ্ছে?’ তাদের নিজ নিজ স্বামীরা। সবকিছু থেকে সুরক্ষা দিচ্ছে। দুঃখ-কষ্ট, লজ্জাহীনতা, এমনকি অজ্ঞানতা থেকেও। কারণ, তাকে সঠিক শিক্ষা দেয়াও তার স্বামীর দায়িত্ব। সে তাকে সব দিক থেকে নিরাপদ রাখছে।

আর যারা বিয়ে করতে ইচ্ছুক তাদেরকে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, ‘মুহসিনীনা গাইরা মুসাফিহীন’। তারা হলো সেসব মানুষ, যারা পরিবার গঠনের উদ্দেশ্যে নিজেদের পরিচর্যায় নারীদের এরূপ নিরাপত্তায় আনতে আগ্রহী।

শুধুমাত্র তাদের নিজেদের কামনা পূরণ করার জন্য নয়। ‘মুসাফিহ’ বলতে এমন কাউকে বুঝায়, যে নিজের হরমোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর এ কারণেই সে বিয়ে করতে চায়। এটাই একমাত্র কারণ। তাই আল্লাহ বিয়ের সম্পর্কে আমাদের মনোভাব পরিবর্তন করেছেন। যদি আপনি সঠিক কারণে বিয়েতে আবদ্ধ হন, তাহলে আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার একটি সুস্থ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আর যদি আপনি ভুল কারণে বিয়ে করেন, তাহলে অবশ্যই আপনার সংসার অশান্তি হবে, আর আপনি কখনই সন্তুষ্ট হবেন না। ভুল কারণ কী কী হতে পারে? আমার হরমোনের সমস্যা আছে, তাই আমি বিয়ে করতে চাই। আর খুব সম্ভবত আপনাদের অনেকেই এটা কঠিন উপায়ে অনুধাবন করেছেন। কারণ, আপনার নিয়তে ভুল ছিল। আপনার নিয়ত থাকতে হবে একটি পরিবার গুরু করা, আল্লাহকে খুশি করা এবং সমাজে ভালো কিছু বৃদ্ধি করার।

তাই আল্লাহ প্রদত্ত দিনের অন্যান্য সব কিছুর মতো বিয়ের মূলনীতিও হলো, আপনি নিজের দায়িত্ব নিয়ে চিন্তিত থাকুন। আর আপনার অধিকার আদায়ের কথা ভুলে যান। আমি জানি যে এটা খুবই রক্ষণাশীল। কিন্তু আপনি যদি এটা করতে পারেন, ছয় মাস চেষ্টা করে দেখুন কী সুন্দর ফলাফল আসে।

নিজের অধিকার নিয়ে ভুলে যান, শুধু নিজের দায়িত্বটুকু ভালোভাবে পালন করুন। এটা ভাবুন, আমি আমার স্ত্রীর জন্য কী করতে পারি? তার জন্য আমি আরও কী করতে পারি? আমি কি তাকে কোনো উপহার কিনে দিব? কারণ, আমি অনেকদিন তাকে কিছু কিনে দিইনি? তারপর সে যদি কোনো ভুল করে থাকে, তাহলে এমন ভান করুন যেন আপনি তা লক্ষ্য করেননি।

দেখুন, কুরআনে তা কীভাবে বলা হয়েছে—

وَاِنْ تَعَفُّواْ وَتَضْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

‘যদি তোমরা ক্ষমা করো, এড়িয়ে যাও এবং মার্জনা করো তবে (জেনে রেখো) নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।’ সূরা আত-তাগাবুন: ১৪

তাসফাহ্ মানো হলো, পৃষ্ঠা দিয়ে ঢেকে রাখা। আপনি যখন একটি পৃষ্ঠা ঢেকে ফেলেন তখন নিচের পৃষ্ঠায় কী আছে দেখা যায় না, তাই না? সেভাবে আপনার স্ত্রী যদি কোনো ভুল করে, তাহলে আপনি এমন ভান করুন যে, আপনি তা দেখেননি। এটাকে সরাসরি বলার দরকার নেই ‘তুমি আবার এমন কেন করেছ?’ এভাবে আপনি তার ভুলগুলো ঢেকে রাখেন। আর আরও বেশি নিজের দায়িত্বগুলোর প্রতি যত্নবান হোন। আরও বেশি ধৈর্যশীল এবং সহনশীল হোন।

আর সে যখন আপনাকে আঘাত দিয়ে কথা বলবে, তখন আপনি হাসিমুখে তা গ্রহণ করুন এবং জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকুন। নিজের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়ে যান।

স্ত্রীর কাছ থেকে সবাই কিছু নির্দিষ্ট জিনিস চায়। সে আমার যত্ন নিবে, আমার চাহিদার ব্যাপারে খেয়াল রাখবে। আমার কিছু চাহিদা আছে, মানসিক প্রয়োজন আছে, সে আমাকে সঙ্গ দিবে। আরও বেশি ভালো ব্যবহার করবে। আমি যখন বাসায় ফিরি, তখন তার হাসিমুখে থাকা উচিত, সবসময় আমার ভুল ধরা উচিত না। সবসময় আমাকে বাজারের লিস্ট আর লন্ড্রির ব্যাপারে কথা বলবে না, ভালোভাবে কথা বলবে। আপনার মাথায় সবসময় এসব চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। কিন্তু জানেন কি, একজন মুমিন কার কাছে তার চাহিদার কথা বলে? একজন মুমিন সর্বদা তার মালিকের কাছে নিজের জন্য আশা করে। কারণ, আল্লাহ ছাড়া আপনি অন্য যার কাছেই কিছু আশা করবেন, আপনি হতাশ হবেন। এটা আল্লাহ প্রদত্ত একটি সর্বব্যাপী পন্থা। যতক্ষণ আপনি কোনো সৃষ্টিক্রুর প্রতি আশা পোষণ করবেন, আপনি অবশ্যই হতাশ হবেন।

আপনি চান যে, আপনার বস আপনাকে প্রমোশন দিক, এটা ঘটবে না। আপনি বন্ধুর উপর আশা করেন। ভাবছেন যে, সে তার দেয়া সময়মতো আসবে, সে দেরি করবে। অথবা সে আসতেই পারবে না। আপনি সৃষ্টির প্রতি আশা করবেন, কোনো জিনিসের উপর আশা করবেন, আপনাকে হতাশ হতে হবে।

আল্লাহ চান যে, আমরা এটা শিখি যে, শুধুমাত্র তার কাছেই আশা করা উচিত। আর যখন আপনি মন থেকে এটা গ্রহণ করবেন, তখন কি ঘটবে জানেন? আপনার স্ত্রী যখন আপনার জন্য খুব অল্প কিছুও করবে আপনি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ হবেন। কারণ, আপনি তার কাছ থেকে কিছু আশা করেননি।

অনেক সময় এমন ঘটে যে, আমরা কিছু ইসলামি বইয়ে বা কিছু হাদিসে পড়ি স্বামীর অধিকার বা স্ত্রীর অধিকার নিয়ে। আর তারপর যা ঘটে তা হলো, স্বামীরা শুধু স্বামীদের অধিকার আর স্ত্রীরা শুধু স্ত্রীর অধিকার নিয়ে পড়া শুরু করে। সত্য আসলে উল্টোটা। স্বামীদের কী নিয়ে পড়া উচিত? স্ত্রীর অধিকার নিয়ে। কিন্তু সবাই নিজেকে নিয়ে মত্ত। সবাই স্বার্থপর। এমনকি ইসলামের ব্যাপারেও তারা শুধু তাই জানে যেটা তাদের কাজে লাগবে।

যেমন ধরুন, পিতা-মাতা কুরআনের ব্যাপারে কিছু না জানলেও এতটুকু ঠিকই জানে যে, কুরআনে সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তোমরা মাতা-পিতার প্রতি সদয় আচরণ করো। তারা শুধু এতটুকুই জানে। এমনকি এটাও জানে না যে, এটা কুরআনের কোথায় আছে। তারা কেন শুধু এতটুকুই মনে রাখে? কারণ, এতটুকুই তাদের কাজে লাগে। তারপর যেমন পুরুষেরা হয়তো কুরআন নিয়ে খুব বেশি জানে না! কিন্তু যখনি স্ত্রী কিছু বলে, সাথে সাথে স্বামী বলে উঠে ‘আর রিজালু কাওয়ামুনা আলান্নিসা’। কারণ, এটাই তাদের কাজে লাগে। তার মানে আপনি আল্লাহর কথামতো চলছেন না, বরং আল্লাহর দিনকে নিজের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন, ঠিক কিনা?

আমাদের বুঝতে হবে যে, আমাদের দিনে সর্বপ্রথম হলো নিজের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করা। তাই আমরা পড়ব আর এটা শিখব যে, কীভাবে আমরা নিজেদের স্ত্রীদের জন্য আরও ভালো স্বামী হব, আর স্ত্রীরা কীভাবে আরও ভালো স্ত্রী হবে।

কয়েকদিন আগে, স্বামী আর স্ত্রীর অধিকার নিয়ে আমি একটা খুতবা দিয়েছিলাম। আমি দুই ধরনের নোট বানিয়েছিলাম, একটাতে ছিল স্বামীদের প্রতি উপদেশ। আরেকটাতে ছিল স্ত্রীদের প্রতি উপদেশ। আর আমি খুতবাতে বারবার পুরুষদেরকে বলেছি, স্বামীদের অধিকার নিয়ে পড়বেন না। শুধু স্ত্রীদের অধিকার নিয়ে পড়ুন। আমি আপনার জন্য নোট বানিয়েছি, আপনার স্ত্রীরটা আপনি পড়বেন না। শুধু নিজেরটা পড়ুন। কিন্তু খুতবা শেষে প্রায় ২০ জন আমার কাছে ছুটে এল, ‘ভাই, আপনি স্ত্রীদের জন্য যে নোট বানিয়েছেন, আমাদের একটা কপি দিন।’ আমি বললাম, ‘না, আমি আপনাদের কপি দিব না। কারণ, আপনারা বাসায় যেয়েই স্ত্রীদেরকে দেখাবেন, এই যে পয়েন্ট নম্বর ৪ দেখ, দেখেছ? তুমি গত ৬ মাস এটা করনি।’ এটা সত্যি সত্যি একটি সমস্যা। এটা সংসারে অনেক অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। তাই যদি আপনি বিয়ের মাধ্যমে একটি সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান, আপনাকে নিজ দায়িত্বের প্রতি আরও যত্নবান হতে হবে।

আমার স্ত্রী হিজাব করছে না, কী করব

আমাকে প্রশ্ন করা হয়, আমার স্ত্রী হিজাব করছে না, আমি এখন কী করব? প্রথম কথা হচ্ছে, তাকে আর হিজাব করার ব্যাপারে কিছুই বলবেন না। হিজাব বিষয়ে তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিন। একেবারেই বন্ধ করে দিন। কারণ, প্রায় সময়ই দেখা যায়, নিজ পরিবারের সদস্যরাই তার পরিবারে দাওয়াহ দিতে সবচেয়ে অকার্যকর পন্থা অবলম্বন করছে।। তারা অপরিচিত কারও কাছ থেকে কথা শুনতে বেশি আগ্রহী। তার উপদেশ গ্রহণ করতে রাজি, কিন্তু নিজের পরিবারের কাছ থেকে তা শুনতে চাইবে না। এটা কিন্তু আমাদের মতো বক্তাদেরও সমস্যা। তারা সারা দুনিয়াকে দাওয়াহ দিতে পারে। কিন্তু দেখা যায়, বাড়িতে শোনানোর জন্যে তারা অন্য কারও টেপ বা অন্য কারও সিডি নিয়ে আসে। কারণ, পরিবারের সদস্যরা বলতে থাকে, 'তোমার কথা আর শুনতে চাই না! অনেক শুনেছি!'

আপনাকে তাই বুঝতে হবে, যখন পরিবারের কাছে দ্বিনের শিক্ষা দিবেন তখন আপনাকে একটু কৌশলী হতে হবে। আপনাকে ধাপে ধাপে এগোতে হবে। খুব দক্ষ একজন বক্তা খুঁজে বের করুন, যিনি আখিরাত ও শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে বলেছেন। হিজাব না করাটা আপনার স্ত্রীর সবচেয়ে বড় সমস্যা না। হিজাব কেবল রোগের লক্ষণ, আসল অসুখ নয়। তার অসুখ হলো দুর্বল ইমান। বারবার মনে করিয়ে দিয়ে তার ইমানকে চাঙা করুন। আর এজন্য সবচেয়ে শক্তিশালী বই হচ্ছে আল-কুরআন।

কুরআনের যে আয়াতগুলোতে মানুষকে স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে, সেখানে কী কী নিয়ে কথা বলা হয়েছে, বলেন তো? আখিরাত নিয়ে। অতীতের বিভিন্ন অবাধ্য জাতির করুণ পরিণতি নিয়ে। এরচেয়ে শক্তিশালী উপদেশ আর হয় না। এসব আয়াতের মেসেজ হচ্ছে, ‘যেই মানুষেরা উপদেশ গ্রাহ্য করেনি, দেখ তাদের সাথে সাথে কী হয়েছিল। দেখ, তাদের সাথে কী হতে যাচ্ছে।’ তাই না? আপনি যদি আপনার পরিবারে এমন অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন যে, প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ মিনিট আপনারা একসাথে কুরআনের কথা শুনবেন, ভালো কোনো বক্তার কথা শুনবেন, তাহলেই যথেষ্ট। আজ-কাল অসংখ্য বক্তাদের রিসোর্স সহজেই পাবেন। এগুলো কাজে লাগান।

আরেকটি বিষয়। কারও কারও বেলায় দাঁষ্ট হিসেবে আপনি হয়তো সেরা নন। কেউ হয়তো অন্য কারও কাছ থেকে সহজে উপদেশ নেবে। আমরা সবাইকে দাওয়াহ দিতে পারব না। হয়তো কিছু কিছু মানুষের জন্যে আমাদের পদ্ধতি কার্যকর, কিন্তু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সবারই আলাদা আলাদা অনুসারি আছে। ইনশাআল্লাহ, এই কথাগুলো আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে সাহায্য করবে।

আরেকটা কথা। আমার মন বলছে, আপনার স্ত্রীর হিজাবের ব্যাপারে কোনো যুক্তিগত সমস্যা নেই। এমনটা না যে, তিনি হিজাবের গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। তার সমস্যা আসলে তিনি আল্লাহর প্রত্যেকটি আদেশ পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নন। এই সমস্যা সমাধান হয়ে গেলে তিনি এমনিতেই হিজাব এবং অন্যান্য কর্তব্য পালন করবেন, ইনশাআল্লাহ।

সন্তানকে কীভাবে ইসলামের শিক্ষা দেবেন

আমাদের সন্তানদের প্রতি যে সচেতনতা কাজ করে, এটা আসলে আমাদের দিনের ভিত্তি। ব্যাপারটা কোনো নতুন কিছু নয় যে, আমরা মাত্র উপলব্ধি করতে শুরু করেছি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে যে চিন্তা কাজ করে, এটা আমরা পেয়েছি আমাদের পিতা ইবরাহিম (আ.)-এর কাছ থেকে। আসলে তাঁরও আগে আমরা প্রথম যেই সচেতন বাবার কথা জানতে পেরেছি, তিনি ছিলেন নুহ (আ.)। নবি নুহ (আ.) তাঁর সন্তানের ব্যাপারে বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি আল্লাহ আযযা ওয়াজাল-এর কাছে তাঁর সন্তানকে উদ্ধারের জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন।

আমাদের সন্তানের দ্বীনি বিষয়ে আমাদের সচেতনতা, এই ধর্মের বহু পুরোনো ভিত্তি। এটা আমাদের ধর্মের একটি মৌলিক অংশ। সন্তান সচেতনতার বিষয়টা শেখানোর জন্যে আল্লাহ আমাদের বেশ কয়েকবার এমন নবিদের ব্যাপারে জানিয়েছেন, যাদের নিজ সন্তানেরা সমস্যাগ্রস্ত ছিল। একবার নয়, অনেকবার!

ইবরাহিম (আ.)-কে আল্লাহ অত্যন্ত নেককার দুজন সন্তান দিয়েছিলেন; ইসমাইল ও ইসহাক (আ.)। কিন্তু নুহ (আ.) তেমন পাননি। ইয়াকুব (আ.)-এর ছিল কয়েকজন অনুগত সন্তান, আবার কয়েকজন অবাধ্য। তবে বেশির ভাগই ছিলেন অবাধ্য। তার মানে আমাদের নবিদের মাঝেই এমন কেউ কেউ ছিলেন, যারা তাদের সন্তানদের নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এ কথাটা মাথায় রাখা জরুরি।

কারণ, যদি নবিদেরকে তাঁদের সন্তানের ব্যাপারে সমস্যায় পড়তে হয়, তাহলে আপনি-আমি যতই চেষ্টা করি না কেন, এসব সমস্যা আমরা এড়িয়ে যেতে পারব না! এটা আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের অংশ। আল্লাহ আমাদের কয়েকজনকে অনুগত সন্তান দান করবেন, কিংবা আমাদের কিছু সন্তান হবে অনুগত। আবার কিছু সন্তান আমাদের জন্যে হবে পরীক্ষাস্বরূপ। সবাইকেই মানুষ করতে হবে। এটা আমাদের দ্বিনেরই একটা অংশ, আমাদের জীবনের অংশ।

দুটি বাচ্চা কখনোই এক রকমের হবে না। কেবল একটি মাত্র সূত্র প্রয়োগ করে আপনার বাচ্চাদের বড় করতে পারবেন না। উদাহরণস্বরূপ ইয়াকুব (আ.)-এর কথাই ধরুন। আমরা এটা বিশ্বাস করি না যে, তিনি ইউসুফ (আ.)-কে বেশি স্নেহ করেছিলেন, আর অন্যদের কম যত্ন নিয়েছিলেন। তাই তারা ইউসুফের সাথে অন্যায় আচরণ করেছিল।

তিনি একজন নবি ছিলেন। অবশ্যই একজন নবির অন্যতম প্রধান কাজ ন্যায়নিষ্ঠভাবে জীবনযাপন করা। আর আপনি যদি আপনার এক সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হন, আর অন্য সন্তানের প্রতি তা না হন, তাহলে তাতে সুবিচার করা হলো না। একজন নবির পক্ষে এরকম হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ বাবা হিসেবে যতটুকু করা সম্ভব ছিল, তিনি ততটুকু করেছিলেন। তারপরেও উনার সন্তানেরা উনাকে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! শেষে তারাও তাওবা করেছিলেন। কিন্তু নুহ (আ.)-এর বেলায় উনার ছেলে শেষ পর্যন্ত তাওবা করেনি।

আবার উনারা নবি ছিলেন দেখে আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, কারও খুব ভালো চাকরি থাকলে তাতে বাড়তি সুযোগ সুবিধা থাকে। যেমন : আপনাদের কেউ কেউ খুব ভালো চাকরি করেন। তাই আপনার পুরো পরিবারের জন্যে আপনি হেলথ ইন্স্যুরেন্স পাচ্ছেন! তাই না? একজন নবির চাকরি তো বেশ ভালো পদের। তিনি আল্লাহর কর্মচারী! এখানে তো তিনি কিছু সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন; ‘আমি অন্তত আমার পরিবারের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারি।’ অথচ কোনো নবিকেই উনার পরিবারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি; না উনার স্ত্রী আর না সন্তান। এমনকি আমাদের নবিজি ﷺ-এর বেলাতেও না।

একটা অভাবনীয় হাদিস আছে, যেখানে তিনি উনার মেয়েকে বলছেন, ‘ফাতিমা, মুহাম্মাদের কন্যা! আল্লাহর ব্যাপারে সতর্ক হও, আল্লাহর ব্যাপারে সাবধান থাকো। কারণ, আল্লাহর সামনে আমি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না।

তোমার উপরেও আমার কোনো অধিকার থাকবে না!’ তিনি এই কথা বলছেন নিজের মেয়েকে! অন্য কথায়, তিনি আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু শেখাতে চাইছেন। কেবল আমরা মুসলিম হয়েছি বলে বা মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েছি বলে পার পেয়ে যাব ব্যাপারটা এমন না।

আমাদের যাদের মেয়ে সন্তান আছে তারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত। আমরা নবিজির ﷺ পরম্পরাকে বয়ে চলছি। তিনিও ছিলেন কন্যা সন্তানের বাবা। উনার ছেলে হয়েছিল কিন্তু তারা খুব অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিলেন। আল্লাহ উনাকে একাধিক মেয়ে সন্তান উপহার দিয়েছিলেন। তিনি তাদের লালন-পালনের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। কাজেই এমন মহৎ একটা দায়িত্ব পেয়ে আমাদের উচিত সম্মানিত বোধ করা।

ইসলামের আগে কিংবা বর্তমানে ভারত উপমহাদেশে, মেয়ে সন্তান হলে মানুষের মুখ বিকৃত হয়ে যায়! এখন আমি সমাজকে মুখ দেখাব কীভাবে। এই যুগেও?

আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে আছেন। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে সে প্রায় মরেই যাচ্ছিল। কিন্তু সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আপনার মা আপনাকে এসএমএস করলেন, ‘খবর ভালো তো?’ এ কথার মানে কী? তিনি আসলে জিজ্ঞেস করেছেন, ছেলে হয়েছে কিনা। এরপর আপনি কোনো উত্তর না দিলে, তিনি আপনাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, অসুবিধা নেই! এর পরেরবার হবে, ইনশাআল্লাহ। যেন মেয়ে হওয়ার ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক। সুবহানাল্লাহ, কত নিচে নেমে গিয়েছি আমরা।

যারা কন্যা সন্তানকে মর্যাদা দেয় না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, যখন মেয়ে জন্ম নেয় তার মুখ কালো হয়ে যায়। যেন কালো মেঘ তার মুখকে ঢেকে রেখেছে। আর সে হতাশায় ডুবে ভাবছে আমার এইমাত্র একটি মেয়ে হয়েছে, সুবহানাল্লাহ।

যুগ যুগ ধরে সন্তান বড় করার কাজে আমরা বেশ সফল। অবশ্যই নবি ﷺ-এর সময় থেকে এখনকার সময় আলাদা। তবে বর্তমান সময়ের আগ পর্যন্ত, সন্তান লালন-পালনে মুসলিমদের সফলতা অন্য কিছুর তুলনায় অনেক ভালো ছিল।

দুনিয়া আজ চোখের পলকে বদলে যাচ্ছে। সরকার কীভাবে পরিচালিত হবে, তা থেকে নিয়ে আমাদের অর্থনীতি, দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক এমনকি

পরিবারগুলোতেও এই দ্রুত পরিবর্তনের দাগ লেগেছে। মুসলিম-অমুসলিম সব পরিবার এতে আক্রান্ত। আমাদের পরিবারের এখন যেমন অবস্থা দেখতে পাচ্ছি, এর আগে কখনো এমনটা ছিল না। সন্তানদের এখন যেভাবে বড় করা হচ্ছে, ইতিহাসের আর কোনো সময়ে কিংবা অন্য কোনো সংস্কৃতিতে এমনটা ছিল না। বিশ্বায়ন আর যোগাযোগ ব্যবস্থার বৃহৎ উন্নয়নের কারণে, তার উপর ভোগবাদের চরম পর্যায় সৃষ্টি হওয়ায়, আমি একে পুঁজিবাদ বলি না বরং বলি ভোগবাদ। আমরা পণ্যের আসক্ত ভোক্তায় পরিণত হয়েছি। আর এই মানসিকতা আমাদের ঘরের ভেতরেও দখল করেছে।

একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। বাচ্চারা আপনাদের কাছে কী নিয়ে সবচেয়ে বেশি আবদার করে বলুন তো? তারা কীসের জন্যে সবসময় বায়না ধরে বসে থাকে?

স্মার্টফোন? ট্যাব? আইপড? ল্যাপটপ?

তারা এসবের খবর কোথায় পায়? নবি ইউসুফ (আ.)-এর মতো তারা কি স্বপ্নে দেখতে পায়? তারা কি স্বপ্নে দেখে বলে, ‘আবু, আমি দেখেছি যে একটা আপেল একটা ফোনের উপরে পড়েছে... এই স্বপ্নের মানে কী?’ না! তারা কোথায় দেখেছে আইপড? হয় তাদের বন্ধুর কাছে এসব আছে অথবা টিভিতে দেখেছে। তারা যখন দেখল তার অন্য বন্ধুদের এসব আছে, তারা আপনাদের বলে, ‘আমি ওরকম স্লিকার চাই, আমি ওরকম শার্ট চাই, আমি ওরকম খেলনা চাই।’ এসমস্ত খেলনার আইডিয়া তারা কোথায় পায়? এসবের ইলহাম কোথা থেকে আসে? এগুলো এসেছে মিডিয়া থেকে।

আমরা আমাদের বাচ্চাদের সামনে মিডিয়ার জগতটা উন্মুক্ত করে দিই। এই মিডিয়াই মূলত, বাচ্চাদেরকে এসব খেলনার জন্যে করজোড় বায়না করতে শেখায়! যেন আমরা তাদের এসমস্ত খেলনা কিনে দিই। আর তখন আমরা তাদের এগুলো কিনে দিই। তাছাড়া বাচ্চারাই যে এসবের একমাত্র শিকার তা কিন্তু নয়, আমরাও এর ফাঁদে পড়ি। একটা ব্র্যান্ডের ঘড়ি বা জামা পরলে নিজেকে খুব উচ্চ শ্রেণির মনে হয়, ঠিক কিনা? হঠাৎ যেন আপনার মনে হতে থাকে সব মানুষের ভিড়ে আপনার মান-মর্যাদা বেশি। যেই মুহূর্তে আপনি অ্যাপল স্টোর থেকে একটা আইফোন হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন, হঠাৎ যেন আপনার নিজেকে খুব হ্যান্ডসাম লাগে! নিজেকে খুব ‘কুল’ লাগে।

এসব পণ্য হাতে থাকায় আমরা আসলে ভেবে নিই, মানুষ হিসেবে আমাদের মর্যাদা বেড়ে গিয়েছে। আর আপনি যদি কোনো ব্রান্ডের কাপড় না পরেন, অথবা ওই ফোনটা যদি আপনার না থাকে কিংবা আপনার এই ‘খেলনাটা’ নেই অথবা ওই ‘খেলনাটা’ নেই, তাহলে আপনি যেন মূল্যহীন। কোনো কারণে আপনি তাদের ক্যাটাগরির নন। অন্যেরা আপনার চেয়ে শুধু এ কারণে ভালো যে, তাদের হাতে যেটা আছে সেটা আপনারটার থেকে ভালো। আমরা মুসলিমরা কেমন যেন অচেতন ভোক্তায় পরিণত হয়ে গিয়েছি। এমনটাই আমাদের বর্তমান অবস্থা।

সন্তান লালন-পালন নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের তাই আগে বুঝতে হবে, আমাদের চারপাশের দুনিয়াতে কী হচ্ছে। ভেবে দেখতে হবে নিজের সাথে কী হচ্ছে, সারা দুনিয়াতে কী হচ্ছে। এটা বেশ বড় একটা সমস্যা।

দ্বিতীয় সমস্যাটা হলো, আপনার কাছে সাফল্যের মানে কি, কিসে আপনার মর্যাদা বাড়ায়। এখন তো বাচ্চাদের এই মানসিকতা দিয়ে বড় করা হচ্ছে যে, তাদের মূল্য এসব প্রোডাক্ট দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে ব্রান্ডের কাপড় পরছেন, যে বাসায় থাকছেন, যেই গাড়িটা চালিয়ে তাকে স্কুলে দিয়ে আসছেন, যে ব্রান্ডের ব্যাগ কাঁধে নিচ্ছেন এসব ব্যাপার। এগুলোই মানুষ হিসেবে আপনার দাম ঠিক করছে। আর এর সাথে যোগ হয়েছে আরও একটা সমস্যা জীবনে সফল হওয়া বলতে কী বুঝায়?

আপনাদের মধ্যে কারও কারও হয়তো শিক্ষার ভালো সুযোগ ছিল না। কিংবা আপনাদের বাবা মায়ের সেই সুযোগ হয়নি। আপনাকে শিক্ষিত করতে যা যা করতে হয়, তারা তাই করেছেন। সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। আপনিও আপনার জীবন থেকে এই শিক্ষা পেয়েছেন। তাই আপনি বলেন, ‘আমার বাচ্চার জন্যে আমি সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা রাখব’। এই ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে, তাকে প্রাইভেট স্কুলে পাঠাতে হলে, হোক। বাড়ি ভাড়া করতে হলে, হোক। ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে হলে, হোক। অস্বস্তিকর পরিবেশে থাকতে হলেও সমস্যা নেই। তাদের সুশিক্ষার স্বার্থে আপনি সব করতে রাজি আছেন। এমনকি ধারকর্য করে, লোন নিয়ে ডোনেশন দিয়ে এসব করতে হলে, তবুও আমরা রাজি। কারণ, আপনাদের কাছে সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বাচ্চার সুশিক্ষা।

আপনাদের সন্তানকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, শিক্ষা না পেলে তুমি ব্যর্থ মানুষে পরিণত হবে। তোমাকে কলেজ পাস করতে হবে। এটা পাস করতে হবে। ওটা পাস করতে হবে।

আপনি যদি ভারত উপমহাদেশের হোন, তাহলে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার না হলে আপনি ব্যর্থ। আপনি সার্জেন্ট হতে পারেননি দেখে আপনার বাবা-মা আপনার প্রতি আর সন্তুষ্ট হবেন না। আর ডেন্টিস্ট তো একেবারেই হবেন না, ডেন্টিস্ট হওয়া তো অপমাজনক! সেটা নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। এই আমাদের অবস্থা!

ডাক্তার হওয়া আমাদের একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ জানেন? কারণ, এতে সবচেয়ে বেশি টাকা আসে। এজন্য না যে আপনি কারও জীবন বাঁচাতে পারছেন। কিংবা মানবতার সাহায্য করছেন। এ ধারণার সাথে ডাক্তার হওয়ার কোনো সম্পর্কই নেই! যদি ডাক্তার আর বাস ড্রাইভারদের বেতন সমান হতো, তবে দেশি কমিউনিটি বাচ্চাকে ডাক্তার বানানোর জন্যে এত লাফালাফি করত না! আমাদের মাঝে নিজের সন্তানকে পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা হিসেবে দেখার কোনো উৎসাহ নেই।

ছেলে ডাক্তার হয়ে ফিরলে মা-বাবার খুশি দেখে কে। কিন্তু সেই ছেলে যদি বলে, ‘আমি তিন বছরের জন্যে এনজিওতে চলে যাব। আমি বন্যা কবলিত এলাকায় তিন বছরের জন্যে কাজ করব। এরপর আমি সোমালিয়া যাব তারপর পাকিস্তানে, তারপর বাংলাদেশে, তারপর মালয়েশিয়াতে; আমি শুধু সেবা দান করব, বেতন নিব না, কোনো লাভের জন্যে কাজ করব না। তখন সেই বাবা-মা বলবে, ‘ইয়া আল্লাহ! তোমাকে ডাক্তার বানাবার জন্যে আমরা আমাদের সব টাকা-পয়সা ঢেলে দিয়েছি। আর এখন তুমি এসব করবে? ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আর ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর মতো তোমার তো রক্তচোষা মেশিনের অংশ হওয়া উচিত ছিল। আমরা তো তোমাকে তা-ই বানাতে চেয়েছিলাম! তুমি কেন মানুষের জীবন বাঁচাবে? তোমার সমস্যা কী?’ এই হলো আমাদের অবস্থা। আর এদিকে আমরা ভাবি আমাদের ছেলে-মেয়েদের মাঝে ঝামেলা আছে! আমাদের উচিত আয়নায় নিজেদের দেখা। আমরা আসলে কাদের তৈরি করছি? আমাদের মানসিকতায় গোঁড়া থেকে খুব বড় একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমাদের কাছে আজ সাফল্য মানে টাকা-পয়সা।

শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের ধারণা হলো, এমন একটা ক্যারিয়ার যাতে অনেক টাকা আসে। সবকিছুর মূলেই অর্থ-সম্পদ। আপনি যদি সফল হন, এর মানে এই যে আপনার অনেক টাকা আছে। আপনি যদি সফল হন, তার মানে এই যে, আপনি শিক্ষা অর্জন করেছেন। শিক্ষা অর্জন করেছেন এমন কোনো ফিল্ডে,

যেখানে আপনার একটা ভালো ক্যারিয়ার হবে। যার মানে যেখানে আপনি অনেক টাকা পয়সা পাবেন। এটাই এখন সাফল্য। কথা শেষ পর্যন্ত একই। এই ধারণা কিন্তু আগেকার যুগ থেকে ভিন্ন।

আগে সবার ধারণা ছিল, আপনি শিক্ষিত হয়েছেন এর মানে আপনি নিজেকে বোঝেন। আপনার চারপাশের জগতটাকে বোঝেন। আপনি পৃথিবীকে আরও সুন্দর বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে কাজ করছেন। এর জন্যে কখনো আপনাকে ইতিহাস পড়তে হবে, কখনো সামাজিক বিজ্ঞান পড়তে হবে, কখনো পলিটিক্যাল সাইন্স পড়তে হবে। কখনো আপনার মিডিয়া নিয়ে পড়াশুনা করতে হবে, কখনো সাংবাদিকতা নিয়ে পড়াশুনা করতে হবে। সমাজে অবদান রাখতে হলে বিভিন্ন ফিল্ডে পড়াশুনা করতে হবে। কেবল একটা ক্ষেত্র নিয়েই পড়ে থাকলে চলবে না। তাছাড়া সবচেয়ে সফল কমিউনিটি যে দিক থেকেই বিচার করুন না কেন, আমেরিকার সবচেয়ে সফল কমিউনিটি হলো তারাই, যারা নিজেদের ছেলে-মেয়েকে কেবল একটা ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে রাখেনি।

আমার এক বন্ধু বলেছিল, ‘যদি স্টিভেন স্পিলবার্গ পাকিস্তানি ঘরে জন্ম নিতেন, তিনি একজন ডাক্তার হতেন’। উনার ফিল্মস্কুলে পড়ার কথা শুনে বাবা-মা বলতেন, ‘তুমি ফিল্ম স্কুলে পড়তে চাও! এসবের মানে কী? তোমার সমস্যা কী? তুমি কী মেডিসিন শাস্ত্রে ফেল করেছ?’ তাদের ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যেত।

সন্তান বড় করা সম্পর্কে এখন কিছু কথা বলি।

সবচেয়ে আগে আমাদের মানসিকতা বদলাতে হবে। তারা যদি আমাদের মাঝে সফলতার সঠিক সংজ্ঞা খুঁজে না পায়, তারা যদি আমাদের ব্যক্তিত্বে, দৈনিক কথাবার্তায় এর প্রতিফলন না দেখতে পায়, তবে আমরাও এটা আশা করতে পারি না যে, তারা নিজেরা নিজেরাই সফলতার সঠিক মানে বুঝে নিয়েছে। তাদের কাছে এ দিকনির্দেশনা আমাদের কাছ থেকেই আসতে হবে।

সারাদিন আমরা সেসব বিষয় নিয়েই কথা বলি, যেগুলো আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যখন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেন, তখন বাচ্চারা তা শুনতে থাকে, তাই না? তাদের কান সবসময় খোলা থাকে।

এখন আপনারা যদি বিল সংক্রান্ত কথাবার্তা বলেন, বাড়ি ভাড়া নিয়ে কথা বলেন কিংবা আপনারা সবসময় মুভি নিয়ে কথা বলেন কিংবা অন্য পরিবার সম্পর্কে কেবল আজেবাজে কথা বলেন, তারা কী করে না করে, এসব আলাপ-আলোচনা করেন, তাহলে তারা ভেবে নিবে যে বড়রা এমনই। আমার বাবা-মা এসব করে। এগুলোই তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।

অন্যদিকে, আপনি আর আপনার স্ত্রী যদি কুরআন নিয়ে কথা বলেন, আখিরাত নিয়ে কথা বলেন, অন্যের জন্যে ভালো কিছু করার কথা বলেন, কাউকে সাহায্য করার কথা বলেন, তাহলে তারা আপনারটা দেখেই শিখে নিবে। এ ব্যাপারে, আপনার তাকে লেকচার দিতে হবে না। তারা কেবল আপনাকে দেখবে। সবচেয়ে কার্যকর প্যারেন্টিং তো সেটাই, যেখানে বাচ্চাকে কোনো কাজ করাতে বাবা-মায়ের কিছু বলতে হয় না; তারা দেখতে দেখতে শেখে।

আপনাদের মাঝে অনেকেই ভাবেন, ‘আমি যদি নোমান ভাইয়ের লেকচারে নিয়ে এসে আমার বাচ্চাদেরকে বসিয়ে শোনাতে পারি, ইনশাআল্লাহ এরপরে তারা নীতিবান হয়ে যাবে। শুধু কয়েকটা ইউটিউব ভিডিও সব মুশকিল আসান।’ এতে আসলে কোনো উপকার হবে না।

আপনার সন্তানের প্রকৃত কাউন্সিলর আপনি। আমার সন্তানের প্রকৃত কাউন্সিলর আমি। আমাদেরকে তাদের সবচেয়ে ভালো বন্ধু হতে হবে।

আগেকার যুগে বাবা-মা আর সন্তানদের মাঝে একটা প্রকৃতজাত সম্পর্ক বিরাজ করত। কিন্তু আজ-কাল বাবারা দিনের বেশির ভাগ সময় কাজে ব্যস্ত থাকেন। বাসায় আসেন ক্লান্ত হয়ে। আর যে সময়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে বাসায় আসেন, তার অধিকাংশ বাচ্চারা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার সকালে যখন তিনি অফিসে যান, বাচ্চারা তখনো ঘুম থেকেই উঠেনি। আর তেমন যদি না-ও ঘটে, তিনি হয়তো যাওয়ার আগে নাস্তার সময় বাচ্চাদের ৫ মিনিটের জন্যে দেখতে পান। তিনিও চলে যান তারাও চলে যায়। তার মানে সাত দিনের মাঝে পাঁচ দিনই বাবা আর বাচ্চার মাঝে তেমন কোনো কথাবার্তা হয় না। তাও যদি হয় সেটা ‘তুমি হোমওয়ার্ক শেষ করেছ?’ ‘আচ্ছা, আমার জন্যে পানি নিয়ে আসো।’ এতটুকুর মাঝেই সীমাবদ্ধ। তারপর আসে ছুটির দিন। কিন্তু ছুটির দিনগুলোতে এখানে দাওয়াত থাকে, ওখানে পার্টি থাকে, আপনার ১২টা পর্যন্ত ঘুমানো লাগে, বাসায় কিছু কাজ করা লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনি তখনো সন্তানের সঙ্গে সময় কাটান না। তাদের সঙ্গে সত্যিকারের কথাবার্তা বলেন না। তাদের সাথে আপনার আসলে কোনো যোগাযোগ হয় না। এটাই মূল সমস্যা।

সপ্তাহের মাঝে হোক, শেষে হোক, আমাদের বাচ্চাদের জন্যে সময় বের করে নিতে হবে। এটাই আপনার এবং আমার জন্যে কার্যকর উপদেশ। কেবল সন্তানদের সাথে কথা বলার জন্যে আমাদের সময় খুঁজে নিতে হবে। শুনুন তারা কী বলে। আজগুবি কথাবার্তা বললে তা-ই শুনুন। আমাদের উচিত তাদের জীবনের একটা বড় অংশ হওয়া।

আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রেই বাস্তবতা হচ্ছে সন্তানের কাছে আপনার একমাত্র ভূমিকা হলো, আপনি বাড়ির একটা দেয়ালের মতো। আপনি জানেন, এধরনের বাবা মায়ের সাথে কী হয়। সন্তান যখন একটু বড় হয় তখন তারা তাদের আচরণের প্রতিফল পায়।

যখন তাদের ১৪/১৫ বছর বয়স হয়, তারা কিছুটা স্বাধীন হয়ে যায়। ধরুন, তখন তারা আপনার কাছে এসে একটা গাড়ি কিনে দিতে বলছে। আর আপনি বললেন, ‘না, তোমার এখন কেন গাড়ি লাগবে?’ সন্তান তখন বলবে, ‘ঠিক আছে, আমি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে চলে যাচ্ছি। আমি একটা চাকরি যোগাড় করে টাকা জমিয়ে নিজের গাড়ি নিজেই কিনে ফেলব।’ এরপর একদিন হঠাৎ করেই আপনি ছেলের কাছে শুনতে পাবেন-

‘বাবা, আমি এখন আলাদা থাকছি।’

‘আলাদা থাকছ মানে? তুমি কোথায় যাবে?’

‘কোথায় থাকব সেটা কোনো ব্যাপার না। আমি এখন বড় হয়েছি।’

আর তখন আপনি দৌড়ে মসজিদে আসেন, ‘ইমাম সাহেব! আমাকে একটা সূরা বলে দিন, একটা দোয়া বলে দিন যাতে আমার ছেলেটা ভালো হয়ে যায়।’

এভাবে কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। ১৭-১৮ বছর বয়সে গিয়ে যখন সংকটে পড়েন, তখন এসব ভাবলে চলবে না। তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে আরও অনেক অনেক আগে থেকে।

এখন আমি ১০ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের মা-বাবার জন্য কিছু পরামর্শ দিচ্ছি। আমি নিজেও এই দলে। আমার সবচেয়ে বড়টার বয়স দশ বছর।

আমাদের জন্যে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, সন্তানকে ইসলাম শিক্ষা দেয়া। যখন নবির (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) দিন শিক্ষা দিতেন, তারা সকলের জন্যে তা করতেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে খুব কম জায়গাতেই বাচ্চাদের শেখার বা উপদেশ নেয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু যখনি তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন, সেটা সব সময়ই বাচ্চার মা-বাবার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কথাটা আবার খেয়াল করুন। আল্লাহ যখনই কুরআনে বাচ্চাদের সঠিক পথপ্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন, সেটা সব সময়ই বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে হয়েছে। আর অভিভাবকের মধ্য থেকে তা সব সময়ই বাবার তরফ থেকে হয়েছে। কারণ, মা তো সারাক্ষণ বাচ্চার পাশেই থাকেন। একজন মাকে বাচ্চার পাশে সবসময় থাকার জন্যে কোনো অতিরিক্ত কষ্ট পোহাতে হয় না। কিংবা বাচ্চার সবসময় খেয়াল রাখতে বা তাকে উপদেশ দিতে হয় না। মাকে কখনো মা হওয়ার ব্যাপারে ট্রেনিং নিতে হয় না, এটা প্রকৃতিগতভাবেই হয়। আল্লাহ তাদের মাঝে এই অনুভূতি দিয়ে রেখেছেন।

অন্যদিকে, বাবাদের অবস্থা শোচনীয়। সত্যিকারের বাবা হওয়ার জন্যে আমাদের একটা ট্রেনিংয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রকৃতিগতভাবে আমাদের মাঝে এই অনুভূতি আসে না।

যখন একজন মা তার সন্তানকে জন্ম দেন, তার সব আবেগ-অনুভূতি বদলে যায়। মুহূর্তেই সব বদলে যায়। কিন্তু একজন বাবার ক্ষেত্রে ৩-৪ দিন পার হওয়ার পর বন্ধু যখন জিজ্ঞেস করে, 'তোমার তো শুনেছি বাবু হয়েছে'। আপনি বলেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু আমি এখনো ধরতে পারিনি কী হয়েছে!' কেউ আপনাকে বুঝিয়ে দিলে আপনি বুঝতে পারেন ব্যাপারটা। আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন? আপনি যেন এখনো ধরতেই পারছেন না কী হয়েছে। কারণ, বাবা হওয়ার যে উপলব্ধি তা স্বভাবগতভাবে আমাদের মাঝে আসে না।

আমাদের এই অনুভূতি গড়ে তুলতে হয়, এর পেছনে শ্রম দিতে হয়, তাই না? এজন্যেই আল্লাহ বলছেন, লোকমান (আ.) সময় করে নিচ্ছেন, সঠিক সুযোগটা বেছে নিচ্ছেন, বাচ্চার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। আমরা দেখেছি ইয়াকুব (আ.) তাঁর সন্তানদের সাথে বলছেন—

يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ

‘আমরা ইবরাহিম (আ.)-কে পেয়েছি, তিনি তাঁর সন্তানদের ঠিক একই উপদেশ দিয়েছেন যা ইয়াকুব (আ.) বলেছেন। বিষয়টা খুবই চমৎকার।’

নিজেকে কীভাবে গড়ে তুলতে হবে বাবারা শুধু সেটাই শেখাননি, ভবিষ্যতে তাকে কীভাবে ভালো বাবা হতে হবে তাকে সেটাও শেখাচ্ছেন। এই মহান দায়িত্ব আমাদের, বাবাদের। আমরাই আমাদের সন্তানকে শেখাব কীভাবে একদিন ভালো বাবা হতে হবে।

সন্তানহীনতা কি আল্লাহর শাস্তি

গালফ ট্যুরে লেকচার দেয়ার সময় এক বোন এক করুণ প্রশ্ন করেছিলেন। তার বিয়ের বয়স দশ বছর। এখনো সন্তান হয়নি। এ নিয়ে শাশুড়ি তাকে বেশ কটু কথা বলেন। ছেলেকে বলেন, 'তোমার বউ একটা বন্ধ্যা'। কখনো সরাসরি, কখনো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এটা তার পুত্রবধুর কলঙ্ক।

সন্তান চাচ্ছেন অথচ হচ্ছে না, এমন মহিলাকে স্বামীর ঘরে নানা মানসিক আঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যেসব শাশুড়িরা আরও চাপ সৃষ্টি করেন, তারা এসব বউদেরকে কোনো ধরনের সাহায্য করতে পারেন না।

বোনটি বলেছিলেন, অনবরত তার শাশুড়ি এসব কথা বলে যাচ্ছেন। তার স্বামী এগুলো বলা থেকে মাকে বিরত রাখতে পারছে না। তার স্বামীও আছেন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে। কারণ, যিনি এসব বলছেন তিনি তার মা। তিনি তার মাকে কীভাবে এইসব কথা বলা বন্ধ করাবেন। এরকম অনেক মহিলা আছেন, এরকম অনেক বিশ্বাসী মহিলা আছেন, যারা একই ধরনের অবস্থার মধ্যে দিয়ে যান। তাদের সন্তান ধারণে অক্ষমতার জন্যে তাদেরকে যেই কথাগুলো বলা হয় তা খুবই অমানবিক।

দেখুন, সন্তান ধারণের সক্ষমতা কোনোভাবেই মানুষের ক্ষমতার মধ্যে পড়ে না। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার। আর যে পরীক্ষাগুলো আল্লাহ

আমাদের করেন সেগুলোর মানে এই না যে, তিনি কতটুকু আমাদের ভালোবাসেন অথবা বাসেন না! আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকেই পরীক্ষা করেন। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কঠিন সময় আসে। প্রকৃতপক্ষে, আপনারা জানেন যে, নবিগণ সন্তানের জন্যে দোয়া করতেন। যেন তাদের সন্তানরা ইসলামের আহবান পরবর্তী লোকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। অনেক নবির কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত কোনো সন্তান ছিল না। দেখা গেল, জীবনের শেষের দিকে গিয়ে একটা সন্তান হলো। তা-ও আবার হয়তো কন্যা সন্তান। এটি ছিল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা।

নূহ (আ.)-এর একজন সন্তান ছিল। কিন্তু নূহ (আ.)-এর সন্তানের মতো একজন সন্তান যেন আমার কখনও না হয়! যে অবাধ্যতা করবে। যার কোনো ভালো কাজ নেই। সে ভালো সন্তান তো নয়ই বরং তার ভালো কোনো কাজও নেই। কুরআনে এই যুবক ছেলে বা পুরুষ সম্পর্কে ভয়ঙ্কর চিত্রায়ন করা হয়েছে। কাজেই প্রথমত এবং প্রধানতম বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষামূলক বিষয়ে আমরা মানুষকে যেভাবে দোষারোপ করি তা থেকে আমাদের পিছু হটতে হবে। এটা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এটা খুবই ভয়ঙ্কর কাজ। এটি উদ্ধত এবং অজ্ঞতাপ্রসূত একটা কাজ।

কিন্তু আমি এই মহিলাকে বলেছি এবং সেইসাথে আমার বোনদেরকেও বলছি, আপনাদের বাস্তববাদী হওয়া উচিত। তার মানে আমি এটা বলতে চেয়েছি যে, মাঝে মাঝে কিছু মানুষ আছে যারা তাদের মতামত দিবে, তাদের অনুভূতি জানাবে তা যতই আনাড়ি হোক না কেন, আপনি তাদেরকে পরিবর্তন করতে পারবেন না। কেউ তাদের পরিবর্তন করতে পারবে না। যত তাড়াতাড়ি আপনি উপলব্ধি করবেন এবং গ্রহণ করবেন, সে এইসব ভয়ানক কথা বলা বন্ধ করবে না। যখনই সে সুযোগ পাবে তখনই সে ভয়ঙ্কর চোখের চাহনি দিবে। মুখভঙ্গি তৈরি করবে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আপনার বা অন্য কারও উদ্দেশ্যে পিছলানো মন্তব্য করবেই। কখনোই, কোনোদিনই, কোনোভাবেই তা বন্ধ হবে না।

আপনি মানুষকে পরিবর্তন করতে পারবেন না। আপনার কাজ হচ্ছে মানুষের সাথে কীভাবে চলাফেরা করতে হয় তা শেখা। মাঝে মাঝে মানুষের সাথে চলাফেরা করা অনেক কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু আপনাকে তাদের সাথেই চলাফেরা করতে হবে। যেই মুহূর্তে আপনি তার কাছ থেকে ভালো কিছু পাওয়ার আশা বন্ধ করে দিবেন, সেই মুহূর্তে আপনি শিখবেন কীভাবে তাদের কটুক্তি ধুয়ে ফেলে দিতে হয়। আপনি সেটা গ্রহণ করুন।

হয়তো এটাই তার দুর্বলতা। সে এর থেকে বের হতে পারে না। এরপর যখন সে কিছু বলবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন সে এটা কেন বলছে, তাই সেটা ভুলে যান। আপনি ওই কথা ধরে থাকবেন না। আপনার কাছেও আসতে দিবেন না।

এগুলোর থেকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আপনি কীভাবে অন্য কাউকে পরিবর্তন না করে এইসব কটুক্তি সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে শিখছেন। আমরা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করি না। আমরা করি না। আমরা যা করতে পারি তা হলো, কোনো কিছু সম্পর্কে আমরা যেভাবে ভাবি তা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিণত করতে।

আমি আপনার কষ্ট বুঝতে পারছি। আসলেই পারছি। আপনি যে অবস্থানে আছেন তার জন্যে আমার নিদারুণ কষ্ট হয়। আপনারা জানেন। একই সাথে, আপনি আপনার জীবনে যেভাবে খুশি হতে পারেন তা হলো, এইসব কথা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা বন্ধ করে দিন। আর আপনার স্বামী যদি গুনে থাকে তাহলে তার প্রতি আমার উপদেশ হচ্ছে, শুনুন! আপনার মাকে একপাশে সরিয়ে নিন। তাঁকে বলুন এইসব কথা বলা বন্ধ করতে। তাকে আপনার এইসব কথা বলা দরকার। আর এটা তাদের অসম্মানিত করবে না। যদি পিতা-মাতা ভুল করে কোনো কিছু করে, কাউকে কটুক্তি করে, তাদের শুধরানো অসম্মানের কাজ নয়। ফেরেশতারা এগুলো পাপ হিসেবে লিখছে। আপনি আপনার মাকে কেয়ামতের দিনে বিপদে ফেলবেন কেন? আপনি কি তাকে ওই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন না?

কিছু না বলা কোনো সঠিক কাজ নয়। আপনি আপনার পরিবারে একটি ভুলকে মৌনভাবে সমর্থন জানাচ্ছেন। নিজের মাকে তার ভুলটা আড়ালে বুঝিয়ে দেয়া, সম্পূর্ণভাবে সঠিক কাজ। আর আপনি যখন বলবেন, তখন সম্মান আর ভালোবাসা নিয়েই বলবেন। তাহলেই সব ঠিক থাকবে। শুধু সম্মান এবং ভালোবাসা নিয়ে বলুন।

আল্লাহ তায়ালা যেন আপনাদের আরও ভালো স্বামী, আপনাদের স্ত্রীদের শক্ত স্ত্রী হওয়ার তওফিক দেন। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের পিতা-মাতাকে ধৈর্যশীল, স্নেহময়ী, সদয় হওয়ার এবং শব্দ প্রয়োগে আরও অনুগ্রাহী হওয়ার তওফিক দিন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জ্ঞানহীন কথাবার্তা বলা থেকে দূরে থাকার তওফিক দিন।

অর্ধাঙ্গীনি না কষ্টাঙ্গীনি

একটি সুন্দর সমাজের জন্যে পারিবারিক শৃঙ্খলা মৌলিক ও প্রধান উপাদান। পরিবারে সামঞ্জস্যতা তৈরি করতে না পারলে দা'ওয়াহর কথা, ইসলামিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলাটা ভালো দেখায় না। বাস্তবতা হলো আমাদের পরিবার হচ্ছে চরম বিশৃঙ্খলার জায়গা। যেখানে আমাদের পরিবারে অশান্তি! স্বামী-স্ত্রী সারাদিন বাক-বিতর্ক জড়িয়ে থাকে। আমাদের পরিবারের ভেতর চলে তিক্ত মন্তব্য চালাচালি। সেখানে আমরা কীভাবে উচ্চতর দা'ওয়াহ আর আদর্শের কথা বলতে পারি?

আমাদের পরিবারগুলোতে চলে জঘন্য টিপ্পনি...

স্বামী : 'তুমি দেখতে একদম সুন্দর না।'

স্ত্রী : 'ও! তুমিও তো ইউসুফ (আ.)-এর মতো না! তোমাকে দেখে তো আর আমি হাত কাটছি না!'

অপ্রয়োজনীয় রঙ্গ! একে অপরের সাথে অপ্রয়োজনীয়, তিক্ত মন্তব্য চালিয়ে যাওয়া। অনেক সময় আপনি জানেন আপনার স্ত্রী কীসে বিরক্ত হয়, আর আপনি ঠিক সেটাই করেন। আবার অনেক সময় স্ত্রীরাও ওই জিনিসটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন, যেটা ওনার স্বামীর চামড়ার নিচে গিয়ে সুঁচের মতো গিয়ে লাগবে। তারপরেও তারা সেটা বলবেন শুধু এইটুকু দেখার জন্যে যে, কী ঘটে!

আর এই সবকিছু কে দেখছে? আপনারা যা কিছু করছেন, এগুলো কে দেখছে? এই ধরনের কটুজির খেলা, আপনার পরিবারে যে যুদ্ধ চলছে এগুলো কে দেখছে? সত্যিকার অর্থে এইসবের শিকার কে হচ্ছে? পরিবারের শিশুরা। শিশুরা এই ধরনের ব্যবহার শিখছে। যখন তারা বড় হবে, তখন তারা কেমন ধরনের পিতা-মাতা হবে? তারা শিখবে বিয়ের মধ্যে ক্ষমা করার কোনো ব্যাপারই নেই!

আপনারা জানেন, মুসলিম পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে তাদের নারী সহকর্মীরা যখন অত্যন্ত অসংগত পোশাক পরে হেসে হেসে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছেন? আপনার দিন কেমন কাটছে?' তখন ঠিকই হেসে হেসে মধু মাখা কণ্ঠে গদগদ হয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, ভালোই। বেশ ভালোই।' এরপর হয়তো ৪-৫ মিনিট কথা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর বাড়িতে ফিরে আপনার স্ত্রী যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করে, 'সারাদিন কেমন কাটল তোমার?' আপনি বলেন, 'আমি কথা বলতে পারব না! সারাদিন অফিসে অনেক পরিশ্রম হয়েছে।' আমরা আমাদের পরিবারের ভেতর এটাই করছি। আমাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্কগুলো এভাবেই ধ্বংস করে দিচ্ছি।

ভাইদেরকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই; শেষ কবে আপনি তাকে কোনো উপহার দিয়েছেন? আপনি হয়তো তাকে নিয়ে বাজারে গিয়েছেন, আপনার স্ত্রী হয়তো কিছু একটা হাতে নিয়েছে আর আপনি বলেছেন, 'না না, এটা রাখো! রাখো।' শেষ কবে আপনি তাকে তার চাওয়া ব্যতীত, কিছু একটা দিয়েছেন? শেষ কবে তাকে ঘুরতে নিয়ে গিয়েছিলেন? শুধু একটু বাইরে নিয়ে যাওয়া আর একটা আইসক্রিম কিনে দেয়া কোনো কারণ ছাড়াই?

তারা আপনার কাছে বেশি কিছু চায় না। তারা আপনার কাছে কিছু সময় চায়। তারা শুধু আপনার একটু সময় চায়।

কিছু কিছু বোন আমাকে এমন সব অভিযোগ করেন, আমি আমার নিজের কানকে বিশ্বাস করাতে পারি না। তারা আমার কাছে অভিযোগ করেন, তারা বুঝতেই পারেন না, তাদের স্বামী ঘরে আছে কী নেই। কারণ, যখন তারা বাড়িতে আসেন, তখন তারা কম্পিউটারে বসেন। ফেইসবুক, ইউটিউবেই সারারাত পার করে দেন। তারা স্বামীদের দেখতে পায় না, আর তারা কাঁদতে থাকেন। এটা এমন যেন, তারা আর বিবাহিত নেই।

কম্পিউটার বন্ধ করুন। আপনার স্ত্রী-সন্তানদের সাথে সময় কাটান। এটার অগ্রাধিকার সবচেয়ে বেশি।

ব্যর্থ প্রজন্মের লক্ষণ

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى
وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ
مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالذَّارِ
الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

‘তাদের পর তাদের স্বেচ্ছাভিষিক্ত হয়েছে এক (অধম) প্রজন্ম। যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, কিন্তু তারা এই তুচ্ছ জগত সামগ্রী গ্রহণ করে আর বলে, ‘আমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে।’ অথচ যদি তাদের কাছে এরকম আরও সামগ্রী আসে তাও তারা গ্রহণ করবে। তাদের থেকে কি কিতাবে অঙ্গীকার নেয়া হয়নি, তারা আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া বলবে না? তারা তো কিতাবে যা আছে তা পাঠও করেছে। বহুত পরকালের আবাসই আল্লাহভীরুদের জন্য শ্রেয়। তোমরা কি তা বোঝ না?’ সূরা আল আরাফ : ১৬৯

এই আয়াতে আল্লাহ এমন এক জাতির কথা বর্ণনা করেছেন, যে জাতি তাদের পূর্ববর্তীদের সকল আশা পূরণ করেছে। আরবিতে আপনি যখন বলেন,

‘খালফ’-এর মানে এমন এক প্রজন্ম যেটি পরে এসেছে এবং আগের প্রজন্মের চেয়ে নিষ্ক্রিয় বা অপরিবর্তিত অথবা তার চেয়ে খারাপ। কিন্তু যখন আপনি বলেন, ‘খালফ’, উপরে ফাতহা তথা যবর যোগ করে, এর মানে হচ্ছে সফল প্রজন্ম। এই আয়াতটি হচ্ছে—

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

‘অর্থাৎ একটি ব্যর্থ প্রজন্ম তাদের পরে দায়িত্ব নিল।’ আমরা আমাদের বলি, আমাদের যুবক সমাজ বলে, আমরা ‘পরবর্তী প্রজন্ম’। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কী ‘খালফ’ নাকি ‘খালফ’? আমরা কি একটি সফল প্রজন্ম নাকি ব্যর্থ পরবর্তী প্রজন্ম? চলুন এই আয়াতের নিরিখে পরীক্ষা করে দেখি।

وَرِثُوا الْكِتَابَ

প্রথমত, ব্যর্থ প্রজন্ম হলো যারা কিতাবটির উত্তরাধিকারী পেল। তারা ভাগ্যবান যে বইটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। অন্য অর্থে, তারা কোথাও গিয়ে মুসলিম হয়নি বা কিতাবটির অনুসন্ধান করেনি। বরং এটি পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকেই তারা পেয়েছে। আর কিতাবটি বংশানুক্রমে পাওয়া সত্ত্বেও—

يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى

তারা এই সর্বনিকৃষ্ট জীবনের অনুপ্রেরণাগুলো ধরে রাখে। এই নিকৃষ্ট জিনিস, এইখানের জীবন, এইসব তাদের মনকে কেঁড়ে নেয়। তারা এসব দুনিয়াবি জিনিস নিয়েই চিন্তা করে। তারা সারাক্ষণ এটাই ভাবে, পরবর্তী খেলা, পরবর্তী মুভি, পরবর্তী খেলনা, পরবর্তী গাড়ি, পরবর্তী বাড়ি, পরবর্তী ছুটি। শুধুমাত্র এসব সম্বন্ধে তারা চিন্তাভাবনা করে। পরবর্তী খাবার, পরবর্তী পোশাক, পরবর্তী জুতা। এসবই তাদের জীবনকে প্রাচীরের মতো ঘিরে থাকে।

আমি কিছুদিন আগে মুসলিম দুনিয়ার কিছু অংশে গিয়েছিলাম। আমি দেখলাম। সুবহানাল্লাহ, আমি তরুণদের দেখলাম। শুধুমাত্র একটা শপিং মলে হেঁটে যাওয়ার সময়, আমার রীতিমতো কান্না পাচ্ছিল। তারা পুরোপুরি মেতে আছে, কী ব্র্যান্ডের তারা পরছে, কোন ব্র্যান্ডের ব্যাগ তারা নিচ্ছে এসব নিয়ে। তারা বেরই হয় এমনভাবে যেন, তারা আপনাকে দেখাতে পারে তারা একটা ব্র্যান্ডের নাম বয়ে নিচ্ছে। আপনি একটি ব্যক্তি নন, আপনি হচ্ছেন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের একটি কোট হ্যান্ডার। আপনি আসলেই আর কোনো ব্যক্তি নন। এটা হলো—

يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى

‘এটা হলো ব্যর্থ প্রজন্ম।’

وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا

আর এই বস্তুবাদী দুনিয়া থেকে, তারা এটা বলারও সাহস রাখে, ‘ওহ আমাদেরকে মাফ করে দেয়া হবে।’

سَيُغْفَرُ لَنَا

‘ওহ আমাদের ঢেকে দেয়া হবে। আমরাই বেঁচে যাওয়া প্রজন্ম।’

যখন জিজ্ঞেস করেন, ‘কেন তোমাকে মাফ করে দেয়া হবে? তোমার কী এমন গুণ আছে?’ তারা তাদের পূর্ব প্রজন্মের সাফল্যের উদ্ধৃতি দেয়।

وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

আর তাদেরকে যদি তাদের দ্বিন ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে কাজ করতে দেয়া হয়, তারা এটার জন্যে দৌড়ে যাবে। পরবর্তী হাল ফ্যাশনের দিকে ছুটে যাবে। বর্তমানে যারা হুজুগ তারা হচ্ছে সেটার মধ্যে। যদি কোনোকিছু এদিকে যায়, সেটা তাদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তির সাথে যায় কি যায় না, তাতে কিছু যায় আসে না। তারা শুধু এটার পেছনে দৌড়াবে। কোনটা ঠিক বা ভুল তা চিন্তাও করবে না। একটা নতুন ছবি এল, ‘ওহ এখানে শুধু কয়েকটা খারাপ দৃশ্য আছে। ভাষা বা অন্য কিছুর জন্যে রেটিং দেয়া আছে। কিন্তু কী হবে, সবাই তো দেখছে, চল আমরাও দেখি!’ তাদেরকে যদি আরও অন্য বিষয়বস্তু দেয়া হয়, তারা সেটিকে জড়িয়ে ধরবে।

أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ

তারা কি কোনো চুক্তির মধ্যে নেই? আল্লাহ এটি সহজ ভাষায় বলে দিয়েছেন। তরুণ সম্প্রদায়, পরবর্তী প্রজন্ম স্পষ্টভাষী হওয়ার কথা ছিল। আল্লাহর কিতাবের স্পষ্টভাষী মানুষ।

وَدَرَسُوا مَا فِيهِ

এবং তাদের কি এমন মানুষ হওয়ার কথা ছিল না, যারা বইটিতে কী আছে তা নিয়ে অধ্যয়ন করে। তাহলেই তরুণ সম্প্রদায় তাদের পূর্ববর্তীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারবে। তাদের প্রার্থনা তখনই পূরণ হবে, যখন তারা সেই বইয়ের তথ্য উদঘাটন করবে। এর বাণী অনুযায়ী বাঁচতে চাইবে। প্রচন্ড আবেগ সহকারে এই বাণী অন্যদের কাছে পৌঁছে দেবে।

وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ

এবং আখিরাতের বাড়ি তাদের জন্য উত্তম যারা আসলেই নিজেদের রক্ষা করতে চায়।

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তাহলে আপনারা কেন এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন না? আমরা কি সেই সম্প্রদায়, যারা শেষ বিচারের দিন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে উঠাব নাকি নিচে ফেলে দিব?

আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই আরব বা আরবদের বংশধর নন। যারা আরব বংশ থেকে এসেছেন, আপনাদের ইসলাম এসেছে হয়তো সাহাবাদের সময় থেকে। এরপর এটি বংশানুক্রমে আপনার পর্যন্ত এসেছে। যেমন ধরুন, আমরা যারা এশিয়া থেকে এসেছি, যারা আফ্রিকা থেকে এসেছি, যারা ইউরোপ থেকে এসেছি বা পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্ত থেকে এসেছি, আমরা ভাবতে পারি দুই, তিন অথবা চার প্রজন্ম পূর্বে, হয়তো তারও আগে, আমাদের পূর্বপুরুষরা মুসলিম ছিলেন না। কেউ একজন শাহাদাহ নিয়েছিলেন। কেউ একজন মুসলিম হয়েছিলেন। যখন তাঁরা মুসলিম হলেন, তাঁরা পূর্ববর্তী নবিদের কাহিনি শুনলেন, যারা ইসলাম শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং এরপর তাদের পরের প্রজন্মের একটু অবনতি ঘটল। এরপরের প্রজন্মের আরেকটু অবনতি ঘটল এবং অবশেষে ইসলাম হারিয়ে গেল। তাই পরে আরেকজন নবিকে আসতে হলো। যখন তাঁরা এসব কাহিনি শুনতেন, তাঁরা কাঁদতেন এবং বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমাদের সন্তান হবে, আমাদের সন্তান এখনও ছোট। হে আল্লাহ তারা যেন ইসলামের মধ্যে থেকেই বড় হয়। তাদের لا اله الا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলার ক্ষমতা দান করেন, তারা যেন এই বার্তা বহন করতে পারে। আমাকে ইসলাম দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়েছে। আমার পুরোটা জীবন আমি শিরকের মধ্যে ছিলাম। আপনি আমাকে ইসলামের পথে পরিচালিত করেছেন। দয়া করে আমার সন্তানকেও ইসলামের পথে পরিচালিত করেন।' এরপর সেই সন্তানদের সন্তান হলো, তাদের সন্তানদের সন্তান হলো এবং এখন আমরা কয়েক প্রজন্ম ধরে মুসলিম সন্তান জন্ম দিচ্ছি।

আমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে প্রথম যিনি মুসলিম হয়েছিলেন, তিনি হয়তো বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম বা খ্রিষ্ট ধর্মের ছিলেন। সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে তিনি মুসলিম হয়েছিলেন।

তিনি যদি আমাদের আজকের অবস্থা দেখতেন তাহলে ভীষণ কষ্ট পেতেন। আমরা কি তাদের আত্মত্যাগের মর্যাদা রেখেছি? তাঁদের প্রার্থনা অনুযায়ী জীবনযাপন করেছি? নাকি তাদের উত্তরাধিকারীত্বকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছি? আমরা কাদের মতো হয়েছি? অমুসলিম পূর্বপুরুষদের মতো? নাকি আমাদের মুসলিম পূর্বপুরুষদের মতো? আমরা কী খাফ নাকি খালাফ?

আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে خَلْف (খালাফ)-এ পরিণত করেন। আমাদের সকলকে আমাদের পূর্ববর্তীদের গর্ব হওয়ার তাওফিক দান করেন যেন, শেষ বিচারের দিন আমরা তাঁদের দেখতে পাই। আমি সেই ব্যক্তির সাথে দেখা করতে চাই, যিনি আমাদের বংশে প্রথম শাহাদাহ গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, আমি জানি, আমাদের পরিবার এসেছে আফগান অঞ্চল হতে। তাই তাঁরা হয়তোবা সেই সময় বৌদ্ধ ছিলেন। কেউ একজন শাহাদাহ গ্রহণ করে মুসলিম হয়েছিলেন। আমি তাঁদের সাথে দেখা করতে চাই এবং আমি তাঁদের বলতে চাই, আমি তাঁদের বলার মতো ক্ষমতা রাখতে চাই, ‘আমরা সেই বার্তা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বহন করে এসেছি আপনার থেকে। আল্লাহ আপনাকে সেই ব্যক্তি বানিয়েছেন। তাই যা কিছু ভালো আমি আমার জীবনে করেছি এবং আমার সন্তানরা করেছে সব আপনার কাছেই এসেছে।’ এটাই সেই আনন্দ যেটা শেষ বিচারের দিন আমরা পাব, আমাদের পূর্ববর্তীদের সাথে পুনর্মিলনীতে।

সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের গুরুত্ব

আমাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আজ-কাল অনেক উদ্বেগের বিষয় আছে। প্রথম চিন্তার বিষয় তারা কথা বলার মানুষ খুঁজে পায় না।

এটা তাদের বিপথে যাওয়ার প্রধান কারণ। আপনার সন্তানকে আপনি স্কুলে পাঠান; ধরে নিই তারা জেনারেল স্কুলে যায়। অধিকাংশ মুসলিম অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের জেনারেল স্কুলে পাঠিয়ে থাকেন। কারণ, যেকোনো কারণেই হোক তাদের সন্তানদেরকে ইসলামিক স্কুলে পাঠানোর সামর্থ্য বা সুযোগ হয়ে ওঠে না। আপনি বাংলাদেশের যেখানেই থাকুন না কেন, ক্লাস ফাইভ-সিক্সে উঠতে উঠতেই তারা বিভিন্ন নোংরা শব্দ শিখে ফেলে। তারা খুব জঘন্য ভাষা আয়ত্ত করে ফেলে। তারা কিছু বাজে ওয়েবসাইটে ঢোকা শিখে যায়। তারা তাদের স্মার্টফোন, ট্যাব, আইপড, আইফোনে বিভিন্ন নোংরা জিনিস ডাউনলোড করা শেখে। তারা কম বয়সেই এসবে পারদর্শী হয়ে যায়। যেসব জিনিস আপনি ২৫ বছর বয়সেও শেখেননি সেগুলো তারা ১২ বছর বয়সেই জানতে পারে। এটাই বাস্তবতা। এগুলোই এখন হচ্ছে।

আপনারা ফেসবুক ইউটিউব জানেন এখন। আপনার সন্তান এসব ওয়েবসাইটে যায়। সেখানে অচেনা শিকারিরা আপনার কিশোর মেয়ে বা ছেলের সাথে কথা বলতে পারে। একসময় তারা সম্পর্কে জড়িয়ে যায়, আর একে অপরের সাথে দেখাও করে।

এরপর বিভিন্ন কিছু ঘটে যায়। এটা বর্তমানে আমাদের মুসলিম ছেলে-মেয়েদের বাস্তবতা। এগুলোই ঘটছে। এসবের ব্যাপারে আমাদের চোখ বুজে থাকলে চলবে না, আমাদের চোখ খুলতে হবে।

আপনি হয়তো বলতে পারেন, ‘না না, আমার সন্তানরা এমন না।’ তাহলে আমি বলব, প্লিজ জেগে উঠুন!

এসব ব্যাপারে প্রাথমিক সমাধান হলো বাসায় ওপেন এক্সেস ইন্টারনেট রাখবেন না। বিশেষ করে ১৪ বছরের ছোট বাচ্চা থাকলে, এটা রাখবেন না! এটা একটা ভয়ানক কাজ। তাদের ল্যাপটপ দেবেন না। দিতে চাইলে এমন মোবাইল দিবেন যেটাতে কেবল ফোন করা যায়, ইন্টারনেট চালানো যায় না। নতুবা আপনি নিজেই বিপদ ডেকে আনছেন। এ নিয়ে আপনিই পরবর্তী সময়ে আফসোস করবেন। আপনি ভাবছেন এগুলো আপনি তাদের ভালোবেসে কিনে দিয়েছেন; আসলে আপনি তাদের ধ্বংস করছেন। তারা এখনো অত বড় হয়নি যে নিজেরাই বুঝে নেবে, এটা আমার করা উচিত, নাকি উচিত না। আপনি ভালো পরিবার থেকে এসেছেন বলে ধরে নিবেন না যে, তারা একাই সব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে। প্লিজ এই ফাঁদে পড়বেন না। আল্লাহর দোহাই এসব জিনিস নিয়ে নিন। আপনার সন্তানদের বিনোদনের জন্য অনেক পথ আছে।

একটা সময় আপনার সন্তান বয়ঃসন্ধিতে পা রাখে। আমি বিভিন্ন দেশে ঘুরে যেটা দেখি, অনেক অভিভাবক আমার কাছে এসে বলেন, ‘আমার একটা টিনেজ মেয়ে আছে’, ‘আমার একটা টিনেজ ছেলে আছে’, ‘আমি চাই আপনি তার সাথে কথা বলেন’। এরকম ঘটনা আমার সাথে শতবার ঘটেছে। আক্ষরিক অর্থেই শতবার ঘটেছে।

আপনি জানেন, কেন তারা আমার কাছে আসে? বয়ঃসন্ধিতে এলে তারা স্বাধীন হয়ে যায়। যখন তারা স্বাধীন হয়ে যায়, তখন তারা আর আপনার কথা শোনে না। যখন তারা আপনার কথা শোনে না, তখন আপনি এমন কাউকে চান যার কথা তারা শুনবে।

নৌকা ইতোমধ্যেই ভেসে গেছে। যখন তারা প্রায় প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হয়নি, তখন আপনার হাতে সুযোগ ছিল। আমাদের বুঝতে হবে আমরা এখন আর আগের পৃথিবীতে নেই। ছোট থাকতে আপনি তাদের সাথে যে রকম আচরণ করতে পারতেন, এখানে তেমনটি পারবেন না।

আগে তাদেরকে আপনার ইচ্ছেমতো বকতে পারতেন, মারতে পারতেন। সবাই এমনটিই করে এসেছে। আর এখন আপনি তাদের সামান্য বকুনি দিবেন আর তারা বলে বেড়াবে, ‘আরে আমার বাবা পুরো ফালতু একটা মানুষ’। তারা তাদের বন্ধুদের আপনার সম্পর্কে এরকম বলে বেড়াবে।

আমি একটা সানডে স্কুল চালাতাম। সেখানকার হেড ছিলাম। কারিকুলাম ঠিক করা, আকীদা বা বই অর্ডার করা সেখানে আমার কাজ ছিল না। আমার প্রাইমারি কাজ ছিল বাচ্চাদের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করা। তারা স্কুলে বিরতির সময় কী নিয়ে কথাবার্তা বলে সেগুলো শুনতাম। ‘আমার মা আমাকে NC-১৭ ভিডিও গেম কিনে দিয়েছে’। ‘আমার গ্রান্ড থেফট অটো আছে’, ‘তুমি ঐ মুভিটা দেখেছ ওটা PG-১৩! ওটা দেখতেই হবে!’ বা ‘মুভিটা Rated-R আমি দেখেছি। সেটার ডিভিডি-ও আমার কাছে আছে।’

বাচ্চারা এসব নিয়েই কথা বলছে। তারা আপনার সন্তানদের নষ্ট করে ফেলছে। আর একে আপনি ভালোবাসা বলেন? ইবরাহিম (আ.) কি কখনো এগুলোর কাছাকাছিও কোনো কিছুর জন্য অনুমতি দিতেন? আজ এগুলো বাচ্চাদের জন্য উদ্বেগের বিষয়। প্লিজ চোখ খুলুন! সত্যিই, চোখ খুলুন!

আমরা সন্তানদের এমন সব জিনিসের সামনে উন্মুক্ত করে দিচ্ছি, যা ধীরে ধীরে খারাপের দিকেই যাচ্ছে। বিশেষ করে মিডিয়াতে। যেই মুভিটা ১০ বছর আগে ১৩ বছর বয়সের নিচে অনুমোদিত ছিল না সেটা এখন অনুমোদিত হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড নিচে নেমে গেছে। আমি না, পশ্চিমারাই এসব নিয়ে কথা বলছে। এখন সমকামিতার মতো বাজে বিষয়গুলো এমনকি কার্টুনেও সাধারণ হয়ে গেছে। টম অ্যান্ড জেরিও আর আগের মতো নেই। সবকিছু বদলেছে।

চারিদিকে কী হচ্ছে সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের সন্তানরা কী দেখছে, তারা কী ভাষায় কথা বলছে।

যখন আপনি মসজিদে যান তখন আপনি দাড়িওয়ালা মানুষদের দেখেন; তারা নামায পড়ে, ভিন্নভাবে কথা বলে। আপনার বাচ্চারা কী তাদের বেশি দেখতে পায় নাকি বাইরের পৃথিবীকে? তারা যেটা বেশি দেখতে পায় সেটাকেই স্বাভাবিক ধরে নেয়। তাদের কাছে এটা স্বাভাবিক না, ঐটা স্বাভাবিক। আর এটাই আসল সমস্যা। তারা এগুলোকে স্বাভাবিক মনে করে না। তারা বাইরের পৃথিবীকে স্বাভাবিক মনে করে।

আমরা কীভাবে সন্তানদের জন্য একে পরিবর্তন করতে পারি? প্রথমে এসব বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। তারপর এসব সমাধানের ব্যাপারে কথা বলা যাবে।

আমাদের ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে প্রথম চিন্তার বিষয় কী? তারা কথা বলার জন্য মানুষ পায় না। যখন আপনার সন্তান পাবলিক স্কুলে যায়, আর একটা ছেলে আর মেয়েকে একসাথে দেখে বা কোনো মেয়ে আপনার ছেলের কাছে এসে বলে, ‘আমার সাথে সিনেমা দেখতে যাবে?’ অথবা ‘আমরা একটা রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছি, তুমি যাবে? তুমি দেখতে অনেক কিউট।’ এসব আপনার ক্লাস ফাইভের বা সেভেনের সন্তানের সাথেই হচ্ছে। তারা কি বাসায় এসে আপনার সাথে এগুলো নিয়ে কথা বলবে না? ‘আব্বু, একটা মেয়ে না আমাকে বলেছে আমি দেখতে কিউট।’ ‘কী! তোমাকে কি এইজন্যেই পড়ালেখা করতে পাঠিয়েছি?’ ঠাশ! ঠাশ!

এই বাচ্চা জানে যে, তাঁর বাবা-মা এগুলো শুনে মেনে নিতে পারবে না। কিন্তু এসব কথা তো কারও না কারও সাথে শেয়ার করতে হবে। সে কাকে এগুলো বলবে? সে তার বন্ধুদের সাথে এগুলো শেয়ার করবে। আর জেনারেল স্কুলে তাঁর বন্ধুরা কমবেশি তাদের মতোই। তারা তাকে ইসলামিক পরামর্শ দেবে নাকি অনৈসলামিক পরামর্শ দেবে? ‘আরে চালিয়ে যা দোস্ত’ তারা এইরকম পরামর্শই দেবে। আপনি বেশি কঠোর বলে, তারা আপনাদের থেকে তাদের বন্ধুদের সাথে বেশি খোলামেলাভাবে চলবে। আপনি তাদের সাথে কথা বলেন না। আপনি তাদের জন্য সেই দরজাটা খোলা রাখেননি। কারণ, আপনি তাদের উপর সেই আধিপত্য দেখাতেন, যা আপনার বাবা আপনার উপর খাটিয়েছিল। কিন্তু সেটাতো ছোট বয়সে পেরেছেন ভাই, এখন সবকিছু ভিন্ন। আমাদেরকে সন্তানদের বন্ধু হতে হবে। তারা যেন খোলামেলাভাবে কথা বলতে পারে সেই পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

এই সমস্যা আমারও আছে। আমি তিন মেয়ের বাবা। আর আমি অনেকটা রক্ষণশীল বাবা। তাই যখন আমার মেয়ে প্রি-স্কুলে ছিল, তখন একটা ছেলে তাঁর পাশে বসেছিল। আর সে বাড়ি ফিরে বলেছিল, ‘হামজা আজকে আমার পাশে বসেছিল আর আমরা একসাথে রঙ করেছিলাম।’ আমি বললাম, ‘কী?’ তখন আমার স্ত্রী আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি এখান থেকে যাও, আমি ওর সাথে কথা বলছি।’ কারণ, আমি যদি এখন রাগ দেখাই তাহলে সে বুঝে ফেলবে, আমার বাবা হামজার ব্যাপারে কিছু গুনতে পছন্দ করে না।

তাই এর পরে হামজা যদি কোনো কিছু বলে বা করে তখন কি আমার মেয়ে সেটা আমাকে বলবে? না। সুতরাং সেটা বলে আমি নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছি।

আমাদের এসব ব্যাপার মোকাবেলা করা শিখতে হবে। এর কিছু কৌশল আছে। আমাদেরকে সন্তানদের এসব ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে হবে। এটা তাদের দোষ না। আমরাই তাদের সেই স্কুলে পাঠিয়েছি। আমরাই তো তাদের সেই পরিবেশে পাঠিয়েছি। তারা এটা চায়নি। তাই তারা যদি খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, সেটা কাদের কারণে হবে? নিশ্চয়ই আমাদের। তাই আমাদের নিজেদেরও এসবের দায়িত্ব নিতে হবে। ‘তুমি এমন কথা বলতে পারলে?’ ‘তুমি কোথেকে এসব শব্দ শিখেছ?’ এসব বলেই পার পাওয়া যাবে না। ‘আরে তোমরাই তো আমাকে এই স্কুলে পাঠিয়েছ, তোমরাই আমাকে এমন অবস্থায় ফেলেছ’, ‘তোমরাই আমাকে ঐ মুভিটা দেখতে দিয়েছ’, ‘তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করেনি, আমার বন্ধুরা কেমন, তারা কোথায় থাকে, আমরা একসাথে কী করি।’ ‘তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করনি, এটা তোমাদের সমস্যা।’

তাই আপনার সন্তানদের জন্য কথা বলার দরজা খুলে দিন। দেরি হবার আগেই এটা করুন। অনেক ছেলে-মেয়েরা তাদের ঘর ছেড়ে চলে গেছে। আমাদের অনেক মেয়েরা তাদের বয়ফ্রেন্ডের সাথে পালিয়ে গেছে। আমি জানি এসব গুনতে খুব খারাপ লাগে, কিন্তু এটাই বাস্তবতা। আমাদের এর মুখোমুখি হতে হবে। আমাদের অনেক ছেলেদের অন্যের সাথে অবৈধ সম্পর্ক আছে। এটা পুরো অসুস্থ বাস্তবতা। শুধু কাঁদলেই চলবে না, আমাদের এসব বিষয় সমাধান করতে হবে।

তাই প্রথম কাজ হলো সন্তানদের জন্য কথা বলার দ্বার খোলা রাখা।

দ্বিতীয় ব্যাপারটা টিনেজ ছেলে-মেয়ের জন্য।

আর এখানে আমি ইয়াকুব (আ.)-এর উদাহরণ দিব। তিনি একজন অসাধারণ নবি। উনার ছেলেরা কি কোনো অন্যায় কাজ করেছিল? হ্যাঁ। সেটা কি কারও মনে আছে? তারা তাদের ভাইকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বনের মধ্যে গিয়ে তাকে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল আর নকল রক্তমাখা জামা নিয়ে এসেছিল।

ইয়াকুব (আ.) কি বুঝতে পারেননি যে, তারা মিথ্যা বলেছিল? এখানে কয়েকজন তরুণ ছেলে আছে, একজন পিতা আছেন। তিনি জানেন যে, তাঁর ছেলেরা খুব খারাপ কিছু করেছে। তিনি কি বলেছিলেন, ‘বদমাইশের দল! এফুনি তাকে নিয়ে আস!’ আপনি কি উনাকে এমন কিছু বলতে দেখেছেন? না। বরং তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন। আমি যখন তাঁর এমন সাড়া দেখি তখন ভাবি ‘তিনি কেমন পিতা ছিলেন! তিনি তাদের বকলেন না, ধমক দিলেন না।’

কেন বলেন তো? কারণ, তিনি একজন জিনিয়াস পিতা ছিলেন। একজন সচেতন পিতা জানেন যে, কোন বয়স পর্যন্ত সন্তানদের উপদেশ দেয়া যায় আর কোন বয়সে তারা স্বাধীন হয়ে যায় যখন তাদের কিছু বললেও তারা শুনবে না। তিনি জানেন। সেই অবস্থায় আপনি কী করতে পারেন? সাবরুন জামিল। সুন্দরভাবে ধৈর্য ধরার কাজটুকুই করতে পারেন। সময় আগেই পার হয়ে গেছে। তাই আপনার দায়িত্ব হলো এর আগেই তাদের প্রতি খেয়াল রাখা। এখন তারা যদি সেই বয়স পার করেই ফেলে, তখন আপনি সর্বোচ্চ যা করতে পারেন তা হলো, তাদেরকে ভালো সঙ্গীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া।

আর মুসলিম তরুণদের সংস্থাগুলোকে উৎসাহ দিন। এরাই আমাদের সন্তানদেরকে দাওয়াহ দেয়ার হাতিয়ার। আমরা তাদের সাহায্য না করলে তারাও হারিয়ে যাবে। আপাতত ফিকহের বিতর্ক থেকে বেরিয়ে আসুন। তারাবিহ ৮ রাকাত হোক বা ২০ রাকাত, আপনার সন্তান এসবকে পাত্তা দেয় না। অবস্থার উন্নতি হলে তখন সেগুলো নিয়েও আলোচনা করা যাবে। এখন সময় ভালো যাচ্ছে না। আমাদের সন্তানেরা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটাকেই অগ্রাধিকার দিন।

আমার সবচেয়ে প্রিয় দোয়া

যে দোয়াটির কথা বলব, দুটো কারণে তা আমার অত্যন্ত পছন্দের দোয়া। এক আমি বিয়ে করেছি এবং আমার স্ত্রী ও সন্তান আছে। দুই পৃথিবীর বর্তমান সমস্যার কারণে আমাদের সবাইকে এই দোয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে হবে।

এই পৃথিবীর মৌলিক প্রতিষ্ঠান পরিবার, বিপদের সম্মুখীন। এখানকার অধিকাংশ মানুষ এমনকি মুসলমানরাও এই সমস্যা থেকে নিরাপদ নয়। যেই ঝড় থেকে বাঁচতে চাই, সেই ঝড় আমাদের সবার বাড়িতেই। মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। এইসব চিৎকার চঁচামেচি, নাম ডাকাডাকি, হতাশা, দুঃখ, অপমান, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যকার বিভেদ থেকে বাঁচার জন্য।

আমাদের পরিবার বিভক্ত হচ্ছে, ভাই ভাইয়ের সাথে কথা বলে না, পিতা-মাতা সন্তানের সাথে কথা বলে না। আমি সম্পূর্ণ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, যারা ইসলামিক কাউন্সেলিং নিয়ে কাজ করেন, তাদের কাছে কোনো না কোনো মা, বাবা, স্বামী বা স্ত্রী বলেছে আমি আমার সন্তানের সাথে কথা বলতে পারি না। সে আমার সাথে চিৎকার করে, আমরা কথা বলি না। সে এই কাজ করছে, আমি জানি না কীভাবে তাকে বিরত রাখব। আমার স্বামী এই করে, আমার স্ত্রী এই করে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুবহানাল্লাহ, এই সংকট বাড়ির ভেতরে। পরিবার এখন পরিণত হয়েছে এক দুঃখ, হতাশা, রাগের জায়গা। মানুষ যেখান থেকে পালানোর চিন্তা করে। এখানে আল্লাহ আমাদের অত্যন্ত উপযুক্তভাবে এবং সুন্দরভাবে চাইতে বলেছেন যে, পরিবারই হবে আশ্রয়স্থল, বাইরের পৃথিবী হলো ঝড়ের জায়গা। তুমি বাইরে যত দুর্ভোগ পাও, আশ্রয় খুঁজবে তোমার ঘরে। এই ঘর তোমাদের নিরাপদ দুর্গ। এখানে আছে তোমার সঙ্গী-সঙ্গিনী-সন্তান, যাদের দেখলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর হয়। কিন্তু এখন হয় উল্টো। পরিবারের লোকদের দেখলে আমাদের দুশ্চিন্তা শুরু হয়।

আপনারা জানেন মানব অস্তিত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী আবেগ সম্পর্কে। আমি মনে করি সবচেয়ে শক্তিশালী আবেগ হলো সন্তানের জন্য মায়ের আবেগ। এটাই সবচেয়ে শক্ত বন্ধন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বিবাহিত। বিয়ের পর প্রথমদিকে আপনারা একে অপরের প্রতি এতটাই আচ্ছন্ন ছিলেন যে, হয়তো বলেছেন, 'তুমি সত্যিই অসাধারণ। আমার বিশ্বাস হয় না তুমি আমার স্বামী ইত্যাদি অনেক অদ্ভুত আচরণ।' এগুলো অন্যের কাছে হাস্যকর লাগে। স্বামীর মুখে সবসময় একটা হাসি লেগেই থাকে, তেমনি স্বামীর নাম যখন নেয়া হয় স্ত্রী লজ্জা পায়।

দশ বছর সংসারের পর এমন কী হয় যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের নাম শুনে বিরক্ত হোন?

মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক যে সবচেয়ে আবেগি, তার একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে কথা বলছে। পাশের ঘরে বাচ্চা একটু কান্নার শব্দ করল। আর অমনি মা দৌড়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন বাচ্চার অবস্থা দেখতে। স্বামী হয়তো কথার মাঝখানে ছিল, খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছিল, কিন্তু বাচ্চার কান্নার শব্দ শোনার সাথে সাথে মা আর সেখানে থাকতে পারল না। মা আর সন্তানের মধ্যে কোনো কিছুই আসতে পারে না।

পাঠকদের মধ্যে যারা মা তাদের বলছি, আপনারা কি কল্পনা করতে পারেন মুসা (আ.)-এর মায়ের মনের অবস্থা? তিনি শিশুকে পানিতে রেখে দিলেন। আপনি আপনার সন্তানকে সামান্য সময়ের জন্য ঘরের বাইরে রাখলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার স্বামী ফোন করা শুরু করবেন। কোথায় সে, তুমি কি তাকে দেখেছ, তাকে দেখেছ কি করে সে? আপনি আধাঘণ্টা দেরি করে সন্তানকে স্কুল থেকে আনতে গেলেই আপনার কেমন মনে হয়? আমি জানি কেমন লাগে।

আমিও একবার আমার সন্তানকে স্কুল থেকে আনতে দেরি করেছিলাম। আমি জানি, তখন আমার স্ত্রী কী ধরনের মানসিক অস্থিরতার মধ্যে ছিল।

মাঝে মাঝে এমনও হয়, বাসার ভিতরেই আছেন কিন্তু সন্তানকে দেখতে পাচ্ছেন না। তখনই বলে উঠেন, ‘কোথায় গেলে বাবা সামিন, কোথায় তুমি?’ ‘আমি বাথরুমে মা, চিন্তার কিছু নেই। আমি এখানেই আছি।’

এখন মূসা (আ.)-এর মায়ের মনের অবস্থা চিন্তা করে দেখুন। তিনি তার সন্তানকে এমন জায়গায় ছাড়ছেন যেখানে দৃশ্যত মৃত্যু অপেক্ষমাণ। কারণ, পেছনে যা আছে তা আরও নিষ্ঠুর শত্রুসৈন্য। তিনি জানেন না, কী হবে তার সন্তানের সাথে। কী বিপদ অপেক্ষা করছে জানেন না। তারপরও কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করে পানিতে ছেড়ে দিলেন।

সুবহানাল্লাহ!

আরও দুজন নারীর কথা বলি। আরেকজন নারীও বিমর্ষ মানসিক অবস্থায় ছিলেন। এই কাহিনির মধ্যেই। একজন সত্যিকার খারাপ মানুষের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। ফেরাউনের সাথে। আপনারা জানেন, নারীরা মাঝে মাঝে কী কঠিন পারিবারিক পরিস্থিতি থাকে। সাধারণত আমাদের মতো সমাজে আপনি চাইলেই দরকারি নম্বরে কল করতে পারেন। খারাপ কিছু হলে পুলিশকে কল করতে পারেন। এখন এই নারীর বেলায় আমরা কোনো শারীরিক অত্যাচারের কথা জানি না; তবে কুরআন আমাদের স্পষ্ট মানসিক অত্যাচারের কথা বলেছে। তা এত বেশি যে, তাকে সাহায্যের আবেদন পর্যন্ত করতে হয়েছে। তিনি একটা ভয়ংকর সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। আবার তিনি পুলিশকেও বলতে পারছিলেন না। কারণ, তার স্বামী ফেরাউন ছিলেন পুলিশের মালিক। তিনি সরকারের কাছেও অভিযোগ করতে পারছিলেন না। কারণ, ফেরাউন তখন নিজেই সরকার। ফেরাউন ছাড়া, তার কোনো দিকে যাওয়ার উপায় নেই। তিনি ঝড়ের মধ্যে ছিলেন এবং কোনো আশ্রয়স্থল পাচ্ছিলেন না। কিন্তু যখন এই বাচ্চাটি ভেসে এল, তিনি কী বলেছিলেন জানেন? তিনি শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, ‘কুররাতু আইনিন লী’- সে হবে আমার চোখের প্রশান্তি। এই ঝড়ে সে হবে আমার আশ্রয়স্থল। সে হবে আমার একমাত্র আনন্দের উৎস। কারণ, আমি অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে আছি। এই সন্তানহীন নারী একটি শিশু পেল। আর মুহূর্তেই তার সমস্যা হারিয়ে গেল। এমনকি ফেরাউন থেকেও নিজেকে আলাদা করলেন। সে শুধু তাঁর জন্য চোখের শান্তি হবে। অন্য কারও জন্য না। ফেরাউনের জন্য না।

আর একটি বিষয়। কেন এই দোয়া এত সুন্দর, শক্তিশালী ও অলংকারপূর্ণ? আপনারা জানেন, যখন কোনো মা তার সন্তানকে হারান, যা এই ক্ষেত্রে ঘটেছে এবং তিনি যখন আবার সে সন্তানকে ফিরে পান, আপনারা কি ভাবতে পারেন, ঐ মায়ের অনুভূতি? আনন্দ অশ্রু? আপনারা কি ভাবতে পারেন, সে সময়ের আবেগ? এখন বুঝুন কীভাবে আল্লাহ বর্ণনা করলেন, সে আবেগ।

আল্লাহ তার অনুগ্রহের কথা মুসা (আ.)-কে বললেন—

فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ

‘আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম। যাতে করে তার চক্ষু শীতল হয় এবং সে ব্যথিত না হয়।’ সূরা ত্বাহা : ৪০

যাতে তার নয়ন জুড়ায়। আল্লাহ এখানে বর্ণনা করেছেন, সবচেয়ে আশ্চর্যজনক আনন্দের কথা। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক শান্তির, মাতৃ-হৃদয়ের সবচেয়ে অবর্ণনীয় অনুভূতি। কী ধরনের বাক্য রীতি তিনি ব্যবহার করলেন? নয়ন জুড়ায়। অত্যন্ত মজবুত এই ভাব প্রকাশের জন্য। তাই আমরা আল্লাহর কাছে আবেদন করি, আমাদের স্ত্রী সন্তান যেন আমাদের নয়ন জুড়িয়ে দেয়।

আপনারা যখন কেউ বলেন, আমি বিয়ে করতে চাই, তখন আল্লাহর কাছে আরেকটু বাড়িয়ে বলুন, ‘আল্লাহ! আমি এমন স্বামী/স্ত্রী চাই, যাকে দেখলে আমার নয়ন জুড়াবে, আর আমাকে দেখলে তার।’

দেশি বিয়ে

বিয়ে পার্টি নিয়ে আপনাদের চিন্তার খোরাক জাগানোর জন্য কিছু কথা বলি।

খুবই সহজ কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে আজ-কাল লাখ লাখ টাকা লোন নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করা হয়। এতে থাকে আটটি পর্ব। প্রতিদিন একটা করে। পানচিনি, মেহেদি রাত, হলুদ সন্ধ্যা, ওয়ালিমা, বৌভাত ইত্যাদি ইত্যাদি।

অথচ ইসলামে নিকাহ মানে তো কেবল নিকাহ আর ওয়ালিমা। ব্যস শেষ! কত সহজ। কিন্তু না! আমাদের সব অনুষ্ঠান করতেই হবে। আর কেনইবা করতে হবে? কারণ, আপনার কাজিনের বিয়েটা হয়েছিল সেই রকম করে। আমরা যদি সে রকম একটা উৎসবের আমেজ এনে দিতে না পারি, তাহলে সমাজে মুখ দেখাব কেমন করে? আপনার আংকেল কী বলবেন? আপনার দাদী কী বলবেন? অমুক কী বলবে, তমুক কী বলবে? মানুষ কী বলবে, তা ভেবে আপনি এতটাই বিচলিত যে, ক্রেডিট কার্ডের বিশাল ঋণের বোঝা নিতে আপনি প্রস্তুত। এই নতুন সংসারের গুরুটাই হলো ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে। আর তারা বিয়েতে উপহার হিসেবে যা পায়, এই ঋণ পরিশোধ করতেই তাদের দুই থেকে তিন বছর লেগে যায়।

আপনারা কি জানেন, দ্রুত বিয়ে ভেঙে যাওয়ার একটা অন্যতম প্রধান কারণ হলো, অর্থনৈতিক চাপ। অথচ আপনারা বিবাহিত জীবন শুরু করেন ঋণের বোঝা নিয়ে। এই বাড়তি কষ্ট আপনাকে কে নিতে বলেছে?

নবিজি ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করুন। তা কত সহজ ও নির্ভেজাল!

আমার একজন খুব ভালো বন্ধু ইমাম ঈশা। তিনি রুজভেল্ট লং আইল্যান্ডে থাকেন। আমি একবার তার মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়ার জন্য গিয়েছিলাম। আমি মাগরিবের নামাজের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সেই সময়ে এক ভাই মসজিদে ঢুকে বললেন, ‘শেখ আপনি কি একটা নিকাহ পড়াতে পারবেন?’ ঈশা বললেন, ‘হ্যাঁ পারব।’ ‘তাহলে আমি মাগরিবের পরে আসি?’ ঈশা বললেন, ‘আসুন, কোনো সমস্যা নেই।’ আমি ভাবছিলাম, এমন বিয়ে দেখা দরকার। মাগরিবের পর কিছু মানুষ দলবেঁধে মসজিদে ঢুকলেন। সম্ভবত ৮ জন হবে। যার বিয়ে হবার কথা তার গায়ে রক্তের দাগ ভরা একটা অ্যাপ্রোন। এশার নামাজের পর ওয়ালিমা হবে। একটু আগে সেই ওয়ালিমার পশু তিনি নিজেই জবাই করে এসেছেন। মাত্র ৪৫ মিনিটের মধ্যে সব কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছিল। আমরা কোলাকুলি করলাম। আনন্দ করলাম। ব্যস শেষ! এটাই বিয়ের অনুষ্ঠানের নিয়ম। আমাদের দিন এতটাই সরল।

নিকাহ এই দিনের একটি সৌন্দর্য। সত্যিই এটা এক সৌন্দর্য। কিন্তু যখন আমরা নিজেরাই ব্যাপারটিকে জটিল করে ফেলি, আমাদের সকল সমস্যার শুরু হয় সেখানেই। ফলে সৃষ্টি হয় মানসিক চাপ, কদর্যতা।

আপনি মনে করে দেখুন, বিয়ের অনুষ্ঠানে কতগুলো ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল! কত বিতর্ক, কত নোংরামি! একজনের এই সমস্যা তো আরেকজনের এই অভিযোগ। কেন তাকে হোটেল রুমে থাকতে দেয়া হলো না? আমরা কেন প্রথম সারির চেয়ারে বসতে পারলাম না? আর একজন আপনার পোষাক নিয়ে মন্তব্য করেছিল। অযথা ফালতু কিছু বিষয়! আমরা নিজেরাই, নিজের জীবনকে দুঃসহ করে ফেলি। অথচ শারী‘আহ চায় সহজ কিছু।

ইবরাহিম (আ.)-এর সন্তান ভাবনা

আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাঁর অনুগ্রহে গত পাঁচ বছরে আমি পুরো আমেরিকায় ৮০টির মতো কমিউনিটিতে ঘুরেছি। প্রতিটি জায়গায় আমি দু সপ্তাহের মতো ছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ্।

আমি বড় হয়েছি নিউইয়র্কে। জানেন হয়তো, যখন আপনি এক জায়গায় দীর্ঘদিন থাকেন, তখন আপনার আশপাশ ছাড়া বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে, সেটা সম্পর্কে আপনি অনেক সময়ই খবর রাখেন না। তো যেহেতু আমি বাইরে অনেক ঘুরি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাগুলো অনেক কিছুর ব্যাপারে চোখ খুলে দেয়। কখনো কখনো এমন কিছু হয়, যা আমি কখনোই আশা করি না। একদিক থেকে চিন্তা করলে এটা খুব ইতিবাচক।

কিন্তু অন্যদিকে আমি খেয়াল করেছি, আমাদের মুসলিম সমাজে কিছু কিছু সমস্যা আছে, যা প্রায় একই ধরনের। চাই সেটা আপনি ক্যালিফোর্নিয়া থাকেন বা বোস্টনে কিংবা টেক্সাসে অথবা আরকানসাসে। সমস্যাগুলো সব একই। এসব সমস্যার মধ্যে যা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি মারাত্মক মনে হয় তা হলো, আমরা কত দ্রুত আমাদের তরুণ সমাজকে হারিয়ে ফেলছি! কত দ্রুত আমরা আমাদের সন্তানদের সাথে সম্পর্কগুলো খুইয়ে ফেলছি।

ইনশাআল্লাহ এ বিষয়টার গুরুত্বের কথা আমি কুরআনের আলোকে আলোচনা করব। আমি আপনাদের সাথে ইবরাহিম (আ.)-এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করব,

যেন আমরা এই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারি। শেষে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু তথ্য শেয়ার করব। আমরা যদি একটি সমস্যা সম্পর্কে সচেতনই না হই, তাহলে সমস্যা সমাধানের আশাই করতে পারি না। তাই প্রথম ধাপ হচ্ছে, আমাদেরকে সাবধান হতে হবে। সচেতন হতে হবে। সমস্যা যে একটা আছে, তা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। এরপরের ধাপ হলো, আমাদের সবাইকে একসাথে ভাবতে হবে। এর একটা সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। অবশ্যই সেটা হতে হবে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী। এরপর আমাদের মধ্যে যারা একই বিষয়ে উদ্বিগ্ন, তাদের ভাবনাগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। কীভাবে আমরা পরবর্তী ধাপে এগুব, কীভাবে আমরা সমাধানে পৌছাব।

রোগী যদি নিজেকে অসুস্থ না মানে, তার তো কোনো ওষুধের দরকার নেই। কোনো প্রেসক্রিপশন নিয়ে সে চিন্তাই করবে না। একটা সমস্যা যে আছে, এই বাস্তবতা মেনে নেয়া প্রথম কাজ।

আমি এখন সূরা আল-বাকারার কিছু আয়াত দিয়ে শুরু করব। খুব সংক্ষিপ্তভাবে এই আয়াতের উপর আলোচনা করব। এটা কোনোভাবেই এই আয়াতের বিস্তারিত তাফসির নয়। কিছু রিমাইন্ডার মাত্র। মনে করিয়ে দেয়া।

ইবরাহিম (আ.) অনেক অনেক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। যখন হজ্জের সময় আসে আমরা ইবরাহিম (আ.) সম্পর্কে অনেক খুতবা শুনি। কত বিশাল উচ্চতা তিনি অর্জন করেছিলেন! উনি যখন ওগুলো অর্জন করলেন, সবকিছু অর্জনের পর আল্লাহ তাঁকে সার্টিফিকেট দিলেন। এই আয়াত হচ্ছে ঐ সার্টিফিকেট সম্পর্কে।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

‘যখন ইবরাহিম (আ.)-কে তাঁর রব পরীক্ষা করলেন...’ সূরা বাকারা : ১২৪

ইবরাহিম (আ.)-কে আল্লাহ খুবই ভালোভাবে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি সবগুলো পরীক্ষাই অতিক্রম করলেন। সব পরীক্ষার শেষে আল্লাহ ইবরাহিম (আ.)-কে বলেছেন, আমি অবশ্যই তোমাকে মানুষের ইমাম বানালাম। আমি তোমাকে মানব সমাজের জন্য এক অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলাম।

এই হচ্ছে সেই সার্টিফিকেট। এই হচ্ছে সেই সম্মানের স্মারক, যা অনেক কঠিন পরীক্ষা দেয়ার পর ইবরাহিম (আ.)-কে দেয়া হয়েছিল। আমরা কল্পনাও করতে পারব না, একটা মানুষ কীভাবে এই ধরনের পরীক্ষার মধ্য যেতে পারে, যেসব পরীক্ষা ইবরাহিম (আ.)-কে দিতে হয়েছিল।

এই যে আমরা কত সহজে বলে ফেলি, উনি আঙুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। আমরা কত সহজে বলি যে, তিনি নিজের সন্তানের গলায় ছুরি বসিয়েছিলেন। আমাদের বাচ্চা একটা কাঁটা চামচ ধরলেই আমরা বলি, 'এই! ওটা রেখে দাও, এটা বিপদজনক।' আপনি বিচলিত হয়ে পড়েন। যদি আপনার সন্তান চুলার একটু বেশি কাছে যায়, আপনি কী করেন, আর এখানে এই মানুষটা যে নিজের সন্তানের গলায় ছুরি ধরেছে, সুবহানআল্লাহ। এটা বলা সহজ কিন্তু নিজেকে সে জায়গায় বসানোর চেষ্টাটা অনেক কঠিন।

এরপর তাঁর সামনে এল সেই পরীক্ষা, তাঁর পরিবারকে মরুভূমির মাঝে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে রেখে আসা। আমাদের পরিবারকে যখন আমরা কোথাও রেখে আসি, যেমন ধরুন, আপনাকে এয়ারপোর্ট থেকে আপনার ফ্যামিলিকে আনতে হবে। আপনার হয়তো এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে। আপনি ২০টা মিস্‌ড কল পাবেন। এদিকে আপনি বিচলিত। তোমরা কোথায়! সব ঠিক আছে? তারা হয়তো, শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত এয়ারপোর্টের বিশাল পরিসরের কোনো এক বেঞ্চে, বেশ নিরাপদেই বসে আছে। আর আপনি উদ্ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন। অথচ এখানে ইবরাহিম (আ.) তাঁর স্ত্রী, সন্তানকে মরুভূমির মাঝখানে রেখে এলেন! যেখানে মৃত্যু প্রায় সুনিশ্চিত। এরপরও উনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালায় উপর পুরো ভরসা করে তাঁদের রেখে এলেন। এটি কোনো সহজ কাজ নয়।

তো, উনি এই সমস্ত পরীক্ষাগুলোর মধ্যে দিয়ে গেলেন। আল্লাহ বললেন, তুমি পাশ করেছ, তুমি এখন থেকে মানব সমাজের ইমাম। আপনারা জানেন ঐ পরীক্ষাগুলো সহজ কিছু ছিল না। যখন ওনার সাথে ভালো বা মন্দ যা কিছুই ঘটত, উনি প্রথমেই স্মরণ করতেন আল্লাহ তায়ালাকে।

ইবরাহিম (আ.) বলেছেন-

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

'তিনিই হচ্ছেন সেই সন্তা (আল্লাহ), যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনিই আমাকে পথ দেখান। তিনিই আমাকে আহার করতে দেন। তিনিই আমাকে পান করতে দেন। যখন আমি অসুস্থ হই, তিনিই আমাকে সুস্থতা দান করেন।' সূরা শুআরা : ৭৮-৮০

যা কিছুই তাঁর জীবনে ঘটুক, উনি কাকে মনে করেন? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে।

আল্লাহ বলেছেন, একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় উপহার হলো, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এতগুলো কঠিন পরীক্ষার পর আল্লাহ যখন তাঁকে সবচেয়ে সেরা উপহারটি দিলেন, আপনি তখন কী আশা করেন? আপনি আশা করবেন উনি বলবেন, ‘আলহামদুকা ইয়া রাক্বী’ সমস্ত প্রশংসা আপনার, কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি। এটা আমার জন্য অনেক সম্মানের। আমি আপনার নগণ্য বান্দা।

কিন্তু এর বদলে আপনি দেখবেন, ইবরাহিম (আ.) বললেন, ‘ওয়ামিন যুররিয়াতি’ আমার পরের প্রজন্মের কী হবে? ‘যুররিয়া’ কথাটা ‘আবনায়ী ওয়া আওলাদি’র থেকে আলাদা। ‘যুররিয়া’ মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

আল্লাহ তাঁকে মানবজাতির ইমাম করলেন, আর উনি চিন্তিত তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে। উনি আগে থেকেই ভাবছেন ৩, ৪, ৫ প্রজন্ম, ১০, ২০, ৩০ প্রজন্মের কথা। এটা হচ্ছে একজন জিনিয়াসের ভাবনা। এটা হচ্ছে এমন একজনের মাইন্ডসেট, যিনি সত্যিকারভাবে এই পৃথিবীতে তাঁর ভূমিকা কী-তিনি তা ভালো করেই জানেন।

মুসলিমরা অমুসলিমদের থেকে অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা। ওদের সাথে আমাদের ভাবনার ধরন আলাদা। আমাদের ভাবনা-চিন্তা দীর্ঘমেয়াদি। দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা বলতে আমি বলছি না ভবিষ্যতের কথা ভাবুন এবং বাড়ি নিন মর্টগেজে। আমি ঐ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা বলছি না। আমি বলছি সেই দীর্ঘমেয়াদের কথা, যেখানে আল্লাহর কাছে আমরা বিনা মর্টগেজে ঘর পাব। এটা হচ্ছে আসল দীর্ঘমেয়াদি প্ল্যান।

আমরা মুসলিম। ৮০ বছর বয়সী বৃদ্ধ যেকোনো সময়ে মারা যেতে পারে। তারপরও তিনি বীজ বুনে যাচ্ছেন এই ভেবে যে, একসময় গাছ বড় হবে এবং কেউ একজন এর ছায়ায় বসবে।

উনি ঐ গাছ দেখে যেতে পারবেন না। কিন্তু তিনি ভাবছেন ভবিষ্যতের কথা। আমরা এরকমই। এটা আমাদের সাদকায়ে জারিয়া। আমরা সবসময়ই আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত, আমাদের এরকমই হবার কথা। কিন্তু আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি, যে সমাজে ভবিষ্যতে কী হবে, তা তারা ভাবে না। কীভাবে এই সমাজ ভবিষ্যতের পরোয়া করে না, তা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই। এই দেশের কিছু ধনী ব্যক্তি ধনী হয়েছে কীভাবে? সুদভিত্তিক ব্যবসা করে।

এই সুদনির্ভর অর্থনীতিকে, খুবই সাদামাটাভাবে বললে, এই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প! এই লোকটি বিশ্বের ধনী ব্যক্তিদের অন্যতম, তাই না? উনি যদি এই মুহূর্তে তার সমস্ত দেনা শোধ করে দেন, দেনার প্রতিটি পাই-পয়সা মিটিয়ে দেন, তাহলে কী হবে? উনি শূন্যেও থাকবেন না। উনি থাকবেন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার মাইনাসে। উনি মিনিমাম পেমেন্ট দেন এই সম্পত্তিতে, মিনিমাম পেমেন্ট অন্যটাতে, সবগুলো ভাড়া দেন। এরপর আবার সব রিফাইন্যান্স করেন, তারপর আবার অন্য প্রপার্টি ধরেন। এই মানুষটির দেনার উপর দেনা। দেনার পর দেনায় ডুবে আছেন, উনি শুধু সবগুলোতে মিনিমাম পেমেন্ট দিয়ে যাচ্ছেন। তার দেনা সব শেষ করতে করতে, হয়তো তিনশ বছর লাগবে। উনি কি এর আগে মারা যাবেন না? উনি ভাবছেন আমি করে যাই, আর মারা গেলে ওটা তখন অন্যের সমস্যা, কাজেই আমার কীসের চিন্তা!

এগুলো আখিরাতে অবিশ্বাসী মানুষের চিন্তা। আমি আগে বাঁচি। আমি আমাকে নিয়ে চিন্তিত, অন্যদের নিয়ে নয়। তো আপনি জানেন আল গোর (২০০০ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী) চেঁচাচ্ছেন ৫০ বছর পর গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে। উনি বলতে পারতেন, আরে চিন্তা কীসের! আমি মরে যাব ১০ বছরের মধ্যে, আমি পান্ডা দিই না। এটা আমার সমস্যা না।

আমাদের সন্তানরা কী পরিমাণ ঋণের চাপে যে পড়বে, সেটা কে ভাবে? আমাদের নিজেদেরই এখনো কত সমস্যা! তো এই সমাজ হচ্ছে মানুষের অবস্থার একটা দৃষ্টান্ত। আমরা দ্রুত সব কিছু পেতে চাই। আমরা দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা করি না। কিন্তু আল্লাহ তাঁর কিতাবে আমাদেরকে বলেছেন, দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা করতে। তো আমরা যখন এই দেশে (আমেরিকায়) আসি অর্থাৎ মুসলমানেরা এই দেশে আসি, বেশির ভাগই ইমিগ্রান্ট। যখন আমরা দীর্ঘমেয়াদের কথা চিন্তা করি, আমরা ভাবি আমাদের সন্তান কোন স্কুলে যাবে, কোন কলেজে যাবে, কোথায় বাড়ি কিনবে। এই হচ্ছে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা।

আমি বলছি অন্যরকম দীর্ঘমেয়াদের কথা। আমি কীভাবে নিশ্চিত করব যে, আমার পর আরও ৩, ৪, ৫ প্রজন্ম পর তারাও বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর তারা অন্যদেরও শেখাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আমি কীভাবে এটা করব, এটা হচ্ছে আসল দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা। যদি আপনার সন্তান স্কুল থেকে বেরিয়ে, ভালো ডিগ্রি নিয়ে, ভালো চাকরি পেল এবং খুব ধনী এক পরিবারে বিয়ে করল। কিন্তু এরপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হারিয়ে ফেলল এক প্রজন্মেই! আপনি সফল হলেন নাকি ব্যর্থ হলেন, ভেবে দেখুন। এর জবাব কে দিবে?

তখন তাকে আল্লাহর ঘর নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। উনি যখন আল্লাহর ঘরের দিকে যাচ্ছেন তখন দোয়া করলেন—

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ

‘হে প্রভু! এই শহরকে শান্তিময় করে দাও এবং এর বাসিন্দাদের জন্য সব ধরনের ফলমূল দান কর।’ সূরা বাকারা : ১২৬

উনি দুই ভাগে দোয়া করলেন। উনি বললেন, এই শহরকে নিরাপদ রাখ এবং দ্বিতীয়ত, ওরা যেন সব ধরনের জীবিকা অর্জন করতে পারে।

সাহিত্যে একটি কথা আছে, শান্তি ও সমৃদ্ধি। পলিটিক্যাল সাইন্সে আপনি জানবেন, একটা সমাজ সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য প্রথম যা দরকার, তা হলো আইনের শাসন, মানে শান্তি। যদি আপনার ঘর নিরাপদ না থাকে, আপনার দোকান, আপনার অফিস, আপনার টাকা-পয়সা নিরাপদ না থাকে, তাহলে সে রকম সমাজে আপনি চলতে পারবেন না। আবার আপনার যদি শান্তি থাকে, কিন্তু কোনো চাকরি-বাকরি না থাকে, আয়-রোজগারের কোনো উপায় না থাকে, যদি ব্যবসা করার পথ না থাকে, তাহলে সেই সমাজে কি টিকে থাকতে পারবেন? না! তো আপনার দরকার শান্তি এবং সমৃদ্ধি।

এই মানুষটির দোয়ায় কত চিন্তাশীলতা দেখুন। উনি বললেন, এই শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং এদেরকে সব ধরনের ফলমূল দান করুন। কিন্তু এর সাথে একদম শেষে উনি ছোট্ট একটা দাবি যোগ করলেন।

ইবরাহিম (আ.) বললেন—

مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

অর্থাৎ আপনি আমার সেই সন্তানদেরই শুধু দিন যারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে। আল্লাহ ওনাকে বলেছিলেন, আমার প্রতিশ্রুতি অবিচারকারীদের জন্য নয়। উনি বললেন, ঠিক আছে এই শহরকে শান্তির শহর করে দিন এবং এর মানুষদের জন্য সব ধরনের রিজিকের ব্যবস্থা করে দিন; কিন্তু শুধু ইমানদারদের জন্য। অন্যকথায়, অবিশ্বাসী, পাপী সন্তানদের জন্য নয়। ওরা দুর্ভিক্ষে পড়ুক। তাদের বংশ নির্বংশ হয়ে যাক। কারণ, আমি ওদের জন্য জবাবদিহি করতে পারব না। আমি শুধু আমার ইমানদার সন্তানদের জন্য জবাব দেব।

কী ভীষণ বিচক্ষণ দোয়া! সুবহানআল্লাহ। উনি বললেন, ‘শুধু যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে’। আল্লাহ তায়ালা এর জবাবে বললেন—

وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتَّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

‘যারা অবিশ্বাসী আমি তাদেরকেও উপভোগ করতে দেব। এরপর তাদেরকে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামের আগুনে ঠেলে দিব। কী ভয়াবহ সেই আবাস!’ সূরা বাকারা : ১২৬

ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর ঘর বানাচ্ছেন, উনি কী সেটা একা করেছিলেন? ওনার সাথে কে ছিল? ইসমাইল (আ.)। তো ইবরাহিম (আ.)-এর বিচক্ষণতা আপনি দেখতে পারছেন।

আমরা মনে-প্রাণে কোনো কিছু আল্লাহর কাছে কখন চাই? যখন আমার কোনো কিছু খুব দরকার। খুব প্রয়োজন। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা এমন করে। আগামীকাল তোমার ফাইনাল পরীক্ষা, তুমি কোনো পড়াশোনা করনি এবং তুমি এই পাঁচ মিনিট আগে বললে, ‘ইয়া আল্লাহ’... ‘পরীক্ষা’। হঠাৎ তোমার মনে পড়ল আল্লাহর কথা। আল্লাহকে স্মরণ করছো সুবিধামতো, নিজের যখন দরকার। কিন্তু আল্লাহর কাছে কিছু চাইবার সবচেয়ে সেরা সময় হচ্ছে, যখন তুমি আল্লাহকে খুশি করার মতো কিছু করেছ। চাইবার জন্য সেটা হচ্ছে সবচেয়ে সেরা সময়। তুমি জানো সেরা সময় কখন? নামাজের পর!

তুমি এইমাত্র আল্লাহর কথা মানলে। এখন দোয়া কর, আল্লাহর কাছে চাওয়ার সবচেয়ে সেরা জায়গার একটি হলো আল্লাহর ঘর। যখন তুমি ওখানে যাও, তা আল্লাহর প্রতি বাধ্যতার একটি শ্রেষ্ঠ কাজ। এটা হচ্ছে চাইবার জন্য সেরা সময় আল্লাহর কাছে চাইবার আরেকটা সেরা সময় হলো, রাতের শেষ ভাগ। কারণ, তখনই তুমি আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে ভালোভাবে বাধ্যতা দেখালে। দোয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ সময় হলো রমজান মাস। কারণ, তখন তুমি আল্লাহর প্রতি বাধ্য থাকছ। তখন আল্লাহর কাছে চাও।

ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর প্রতি বাধ্যতার সেরা একটি কাজ করছেন। উনি তাঁর ছেলেকে সাথে নিয়ে, এই পৃথিবীতে আল্লাহর ঘর বানাচ্ছেন। এটা সম্ভবত আবারও তাঁর কাছে চাইবার জন্য সেরা সময়, তাই না? তো তিনি আবারও চাইলেন। কিন্তু উনি জানেন, আল্লাহ একবার না বলেছেন। উনি নিজের দোয়া পরিমার্জিত করছেন।

প্রথম দোয়া, রাক্বানা তাক্বাক্বাল মিন্না- ‘হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদের থেকে কবুল করুন’। দেখুন আগের দোয়ায় ছিল, ‘হে আমার প্রভু এই শহরকে শাস্তিময় করে দিন’। ‘রাব্বি’ মানে আমার প্রভু। এখন উনি কী বললেন রাক্বানা আমাদের প্রভু! উনি কাকে সঙ্গে নিলেন তাঁর ছেলেকে, এইবার আমি আল্লাহর ঘর নির্মাণ করছি এবং আমি দোয়া করতে যাচ্ছি, কিন্তু আমি আমার সাথে আমার সন্তানকেও এই দোয়ায় शामिल করছি। যাতে অন্ততপক্ষে এই ছেলের ব্যাপারে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দেন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

‘হে আমাদের প্রভু, আমাদের দুজন থেকে কবুল করে নিন। নিঃসন্দেহে আপনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাতা।’ সূরা বাকারা : ১২৭

সুবহানআল্লাহ। তো উনি একটা ছেলের ব্যাপারে নিশ্চিত করলেন। পরবর্তী আয়াত এই দোয়ারই ধারাবাহিকতা, যার মানে হলো আল্লাহ কিছু বললেন না। আল্লাহ জবাবে নীরব থাকলেন এবং নীরবতা মানে কী? কবুল করা। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তিনি আবারও বলতে শুরু করলেন। যেহেতু আরও আগেই আল্লাহ কবুল করেছেন, তাই উনি থামলেন না। বললেন-

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

‘হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুজনকেই আপনার কাছে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করার তৌফিক দিন। এবং আমাদের বংশধর থেকে এমন এক জাতি সৃষ্টি করুন যারা হবে আপনার প্রতি সমর্পিত।’ সূরা বাকারা : ১২৮

আল্লাহ তো তাঁকে ইমাম বানিয়েছেনই, তাহলে এই দোয়া কেন? উনি তো আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেনই। উনি কী আগেই আল্লাহর কাছে পূর্ণ সমর্পণ করেননি? সুবহানআল্লাহ! তাহলে উনি এই দোয়া এখন কেন করছেন? কারণ, তিনি তাঁর ছেলেকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে আপনার প্রতি পরিপূর্ণভাবে সমর্পিত করুন। আমার সন্তানদের মধ্য থেকে, সব সন্তানদের থেকে নয়, সন্তানদের মধ্য থেকে। কারণ, ‘মিন’ এখানে একটা অংশের কথা বলা হচ্ছে, তাই না? অন্তত আমার সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ কেউ হবে মুসলিম উম্মাহ, এক উম্মাহ, এক দল, এক জাতি। যারা শুধু আপনার (আল্লাহ) কাছেই সমর্পণ করবে, অন্য কারো কাছে নয়।

এক দল হবে, যারা শুধু আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করবে। আমার সন্তানদের কেউ কেউ হবে যালিম, কিন্তু অন্তত কিছু সন্তানদের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিন।

সবার ব্যাপারে না দিন, কিন্তু কিছু সন্তানের ব্যাপারে অন্তত প্রতিশ্রুতি দিন, যারা আপনার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে। আমাদেরকে আনুষ্ঠানিকতাগুলো দেখিয়ে দিন। আমরা ঘর নির্মাণ করেছি। আমরা জানি না, কীভাবে এই ঘরে প্রার্থনা করতে হয় এবং কীভাবে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে হয়। আমরা কীভাবে তাওয়াফ করব, কীভাবে নামাজ পড়ব; তা আমাদেরকে শেখান। আমাদেরকে এই ইবাদতগুলো শেখান এবং আমাদের তওবা কবুল করুন।

আপনারা জানেন আমরা কখন তওবা করি, যখন কোনো গুনাহ করি, যখন কোনো পাপ করি, তখনই তওবা করি। উনি কেন তওবা করেছেন? উনি কী কোনো ভুল কিছু করেছিলেন? উনি ছিলেন একজন সেরা রাসূল ﷺ। তো কিসের তওবা করেছিলেন উনি? এখান থেকে যে কল্যাণটা আমরা নেব, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

যখন আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু করেন। ধরুন, এইমাত্র আমরা নামায পড়লাম। আমরা কি আমাদের নামাযে ভুল করি? আমাদের অযুতে কি ভুল থাকে? আমাদের মন কি বিক্ষিপ্ত থাকে? রাতে কী খাব? ওরা বলল, রাতে খাওয়া-দাওয়া হবে না। তো যখন রুকু থেকে উঠেন, আপনার পেট মোচড় দিয়ে ওঠে, আর আপনি বলেন ‘আহ, আমি ভাত চাই’। এসব আমাদের মাথায় ঘুরতে থাকে। তো এটা কি নামাযে গাফেলতি নয়? অবশ্যই। তো আপনি নামায পড়েছেন মানে এই নয়, আপনি সবচেয়ে ভালোভাবে নামায পড়েছেন। এজন্য আপনার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। এমনকি যেসব কাজ শুধু তাঁর জন্যই করেছেন, সেগুলোর জন্যও। তিনি আল্লাহর ঘর বানাচ্ছেন, অথচ দেখুন তাঁর বিনয়। আমি আপনার ঘর বানাচ্ছি, আমি হয়তো যে জায়গায় ইট রাখার কথা সেখানে রাখিনি। হয়তো আমি ভুল করেছি, হয়তো আমি জানিই না আমার ভুলটা কী। তো আমি যদি আমার অজান্তেই কোনো ভুল করে থাকি, আমি আমার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইছি। আমাদের তওবা কবুল করুন।

এই জিনিসটা ইবরাহিম (আ.) থেকে আমাদের শেখার আছে। আমরা মানুষকে বলি ইস্তেগফারের কথা। আরে আমি তো কোনো ভুল করিনি! আমি কেন ইস্তেগফার করব? আপনি অনেক ভুল করেছেন। আমরা অনেক ভুল করেছি। জেনে হোক বা না জেনে। উনি তওবা করলেন। এরপর আল্লাহ কিছু বললেন না, এর মানে হলো তিনি তার দোয়া কবুল করে নিয়েছেন। এরপর উনি আবারও শুরু করলেন।

উনি বললেন-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

‘হে আমাদের রব! তাদের কাছে তাদের মধ্য হতে এমন একজন বার্তাবাহক প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন।’ সূরা বাকারা : ১২৯

উনি খুব সাবধানে ভাবছেন, আল্লাহ ওনাকে কী বলেছেন। উনি খুব মেপে কথা বলছেন। উনি বললেন, ‘হে আমাদের প্রভু! আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্য থেকে একজনকে আপনি রাসূল হিসেবে মনোনীত করুন। শুধু একজন রাসূল নয়, তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল। এটি অসাধারণ বিচক্ষণতা।

যদি একজন রাসূলের কথা বলা হয় এবং তিনি যদি বাইরের লোক হন, তখন মানুষ বলবে, আমি তোমার কথা শুনতে চাই না! তুমি তো ভিনদেশী। মানুষ ভিনদেশী মানুষের কথা শুনতে চায় না। যখন আপনাদের কেউ পাকিস্তান বা ভারত থেকে আসেন, আর আপনার সন্তানরা পুরো আমেরিকান; যখন ওরা পাকিস্তানে যায়, কেউ তাদের কথা শুনতে চায় না। মানুষ তাদের কথা বলা নিয়ে ঠাট্টা করে। আবার যখন আরব বিশ্বের কেউ এখানে আসে অথবা সুদান, ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়া থেকে, তারা ইংরেজী বলতে পারে না। তারা এখানে এসে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে চাইলে, লোকজন কি তাদের কথা ভালো করে শোনে? না, শোনে না। তারা শোনে না, কারণ তারা পরিচিত নয়। তারা বহিরাগত। তো যেকোনো ধর্মেই বহিরাগতদের দেখা হয় অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে। তারা নেতা হতে পারে না। তারা বাইরের লোক।

উনি দোয়া করলেন যেন, তাঁর প্রজন্মের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন। যেন যখন তিনি কথা বলবেন, তখন অন্যরা শোনে। এমন একজন বার্তা বাহকের মানে কী, যদি মানুষ তাঁর কথা না-ই শোনে? তো তিনি বললেন যে, তিনি সাধারণ কোনো একজন রাসূল নয়। বরং উনি তাদেরকে অত্যাশ্চর্য নিদর্শন পড়ে শোনাবেন। উনি তাদেরকে এমন সব বিষয় পড়ে শোনাবেন যা তাদেরকে মোহমুগ্ধ করবে এবং আপনার নিকটবর্তী করবে। যাতে তারা এক কাতারে থাকে। তারা মুসলিম থাকে। তিনি তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দেবেন এবং তিনি তাদের প্রজ্ঞার শিক্ষা দেবেন। সেই সাথে উনি তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন।

এটা ইবরাহিম (আ.)-এর খুব চিন্তাশীল দোয়া ছিল। আমরা আমাদের শৈশবে শিখেছি, তাঁর এই দোয়ার ফলেই আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন। আপনি দোয়ার শক্তি বুঝতে পারছেন? ইবরাহিম (আ.) এই দোয়া করলেন, কোন মোটিভেশন থেকে? ওনার মোটিভেশন ছিল, ‘আমার সন্তানেরা’। একজন পিতা আন্তরিকভাবে তাঁর প্রভুর কাছে চাইলেন এবং তাঁর প্রভু এর জবাব দিলেন। ইবরাহিম (আ.)-এ দোয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জবাব মানবজাতি দেখল, নবিজির আগমন। কখনো দোয়ার শক্তিকে তাই খাটো করে দেখবেন না। কখনো দোয়ার শক্তি তুচ্ছ করে দেখবেন না।

আমরা এখন এই যে ঐশী গ্রন্থ কুরআন পড়ছি এটা এসেছে একটি দোয়ার ফলে। এটা এসেছে একটি দোয়ার জবাবে। পুরো বিশ্বের শতশত নয়, মিলিয়ন মিলিয়ন নয়, বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ বলছেন, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। আল্লাহ একদিন তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন, পবিত্র করবেন, উনি তাদের জন্য কিতাব পড়বেন। এটা হচ্ছে একজন উদ্বিগ্ন পিতা, যিনি অগ্রিম ভাবেন, আগে থেকে চিন্তা করেন।

ইবরাহিম (আ.)-এর এই উত্তরাধিকার থেকে কে সরে যাবে? কে অত বোকা? আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন—

وَمَنْ يَزْعُبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي
الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

‘ইবরাহিমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফিরিয়ে নেয়! তবে সে ব্যক্তি, যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং সে পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।’ সূরা বাকারা: ১৩০

পিতৃত্ব বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য থাকায় আমি এ কথাগুলো শেয়ার করলাম। এতে আছে আগামী প্রজন্মের জন্য উদ্বিগ্নের কথা। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে—

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا
تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

‘ইবরাহিম (আ.) এবং ইয়াকুব (আ.) সন্তানদেরকে অসিয়ত করলেন যে, হে আমার সন্তানেরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা পরিপূর্ণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।’ সূরা বাকারা : ১৩২

আমাদের সময়ে মা-বাবারা সন্তানদেরকে বলেন, খবরদার অংকে ৯০-এর নিচে যেন না পাও। খবরদার তোমার বন্ধুদের সাথে যাবে না। খবরদার এটা করবে না, ওটা করবে না। আর উনি তাঁর সন্তানদের বলছেন, আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ছাড়া খবরদার মারা যাবে না। এটা আল্লাহর তরফ থেকে এক উপহার তোমাদের জন্য। এটা তোমাদের জন্য উপহার। এই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-খবরদার তোমরা এটা খোয়াবে না। এটা হচ্ছে একজন উদ্বিগ্ন বাবার উপদেশ।

এই সুন্দর দোয়া যখন উনি করলেন, ‘রাব্বানা তাক্ব্বাল মিন্না’, ওনার সাথে কে ছিল? ইসমাইল (আ.)। কিন্তু এরপরে যে নবির কথা এসেছে উনি কে? ইয়াকুব (আ.)। উনি কার সন্তান ছিলেন? ইসহাক (আ.)-এর। সেই ছেলে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তো আল্লাহ শুধু তাঁর সন্তান এবং তাঁর বংশধরদের দোয়াই কবুল করেননি। তিনি ইসহাক (আ.) এবং তাঁর বংশধরদের দোয়ারও জবাব দিয়েছেন। তাদের মধ্যকার অন্যদের প্রার্থনার জবাবও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দিয়েছেন। আর তারাও সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন পিতা হিসেবে বেড়ে উঠেছিল। ইয়াকুব (আ.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ বাবাদের একজন, যার কথা আমাদের কিতাবে একজন আদর্শ বাবা হিসেবে উল্লিখিত আছে।

তারপর কুরআনে বলা হলো—

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ
بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِلّٰهِ أَبَائُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا
وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

‘তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বলল, আমার পর তোমরা কার ইবাদাত করবে? তারা বলল, আমরা তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের উপাস্যের ইবাদাত করব। তিনি একক উপাস্য। এবং আমরা তাঁর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পিত।’ সূরা বাকারা : ১৩৩

দেখুন, যখন মৃত্যু ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হলো, উনার ছেলেরা উনার পাশে, তাঁর সেবা করছে, পানি দিচ্ছে, কাঁদছে আর উনি ওদের নিয়ে চিন্তিত। উনি এটা নিয়ে চিন্তিত না যে, কাদেরকে ওরা বিয়ে করবে, কোথায় তারা থাকবে, কোথায় সম্পদ খরচ করবে, খেয়াল করে দেবে। ওসব কিছু না।

একদম না। অবশ্যই কলেজের পড়াশুনা শেষ করবে, ওসব নিয়ে কোনো চিন্তা না। বরং তিনি বলছেন, ‘ও আমার ছেলেরা! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দিন মনোনীত করেছেন। সুতরাং খবরদার মুসলিম হওয়া ছাড়া তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না।’ এরপর উনি বললেন, ‘আমার মৃত্যুর পর তোমরা কীসের ইবাদত করবে? আমি চলে গেলে তোমরা কী করবে? কীসের প্রার্থনা করবে? উনি এটা বলেননি, মান তা’বুদুনা- কার প্রার্থনা করবে?; উনি বলছেন, ‘মা তা’বুদুনা’-কীসের প্রার্থনা করবে? যার মানে হলো, উনি তাদেরকে ধাঁধায় ফেলে জানতে চাইছেন। তোমরা কী করবে? কী ধরনের উপাসক গ্রহণ করবে? তারা জবাব দিল, ‘আমরা আপনার ইলাহ এবং আপনার পিতা ইবরাহিম (আ.), ইসমাইল (আ.) ও ইসহাক (আ.)-এর ইলাহর ইবাদত করব এবং আমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছেই সমর্পিত।’

আমি এখানে কিছু সত্যিকার বাস্তবতা শেয়ার করছি। আসুন আমরা এইমাত্র যা শিখলাম তার সাথে নিজেদের তুলনা করি। এটা আগেকার দিনের কাহিনি। উনারা ছিলেন অসাধারণ সন্তান। এই প্যারার শেষে আল্লাহ কী বলছেন জানেন? আল্লাহ বলছেন—

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

‘তারা ছিল এক জাতি যারা বিগত হয়েছে। তারা যা করেছে তা তাদেরই জন্য। তোমরা যা অর্জন করবে তা তোমাদের জন্য। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।’ সূরা বাকারা : ১৩৪

ভাববেন না যে, ‘ওহ! ওসব ছিল সুসময়’... না। তারা পেয়েছে তাদেরটা। আপনি পাবেন আপনারটা। আপনারটার জন্য আপনাকেই কাজ করতে হবে। তারা যা করেছেন, সেজন্য আপনাকে প্রশ্ন করা হবে না। আপনাকে প্রশ্ন করা হবে আপনি কী করেছেন তা নিয়ে।

সবশেষে আল্লাহর কথা হচ্ছে, এ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদেরকে বদলাও। আপনি ওসব ঐতিহাসিক নামগুলো জানেন কী না, সংখ্যাগুলো, তারিখগুলো বা ইয়াকুব (আ.)-এর সব সন্তানের নাম জানেন কী না, এসব নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে না। আপনাকে প্রশ্ন করা হবে আপনি আপনার সন্তানদের নিয়ে কী করেছেন?

নোমান আলী খান-এর জীবনী

কুরআন তার সৌন্দর্যে চিত্তবিমোহনকারী, শব্দের দিক থেকে বিমোহিতকারী, বাণীর দিক থেকে প্রবলতর শক্তিশালী, সঙ্গতি ও ঐক্যতানের দিক থেকে মন্ত্রমুগ্ধকারী এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক থেকে অন্যকে হতবুদ্ধকারী।

উস্তাদ নোমান আলী খান আল-কুরআনের শব্দচয়ন, শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সাথে বাস্তব উদাহরণ, বাক্যের ধরন-গঠন, উপমা, একটি সূরার সাথে অন্য সূরার সঙ্গতি ও সেতুবন্ধন, প্রতিটির ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য অথচ একটি সাথে আরেকটির অর্থগত ও শাব্দিক তুলনায় কত মিল এবং আল-কুরআনের গভীর ব্যাখ্যা ইত্যাদি মুজিয়া ভিত্তিক ও অর্থের দিক থেকে চমৎকার আলোচনার জন্যে সারা বিশ্বেই বেশ সমাদৃত। তার কুরআনের আলোচনা এতটাই প্রিয় যে, সরাসরি অনলাইন ওয়েবিনারে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৯০টিরও অধিক দেশের মানুষজন অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কুরআনের চমৎকার শৈল্পিক সৌন্দর্য উপস্থাপনার জন্যে তিনি বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের মুসলিম তরুণ প্রজন্মের কাছে এক জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। কুরআনের শব্দচয়ন কতটা সৃজনশীল, ভাষা কতটা মনোমুগ্ধকর, অর্থ কতটা যৌক্তিক। এগুলোই নোমান আলী খানের চিন্তাভাবনা ও আলোচনার বিষয়। তাঁর বক্তব্যে কুরআনের অন্তর্গত সৌন্দর্য ও মুজিয়া মানুষের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনার ও অনলাইনে তাঁর বক্তব্য শুনে অসংখ্য মানুষ ইসলামের দিকে ফিরে আসছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তিনি প্রায় ২০টিরও অধিক তাফসিরগ্রন্থ পাঠ করেছেন। ফলে কুরআন নাযিলের ইতিহাস, শব্দচয়নের কারণ, ভাষার অলঙ্কার, অর্থের গভীরতা, যুক্তির প্রখরতা এবং ব্যাকরণগত শুদ্ধতার বিষয়গুলো তাঁর আলোচনায় ফুটে উঠে। তাই অনেক ইসলামি স্কলার নোমান আলী খানকে আল কুরআনের ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এছাড়াও বিশ্বের ৫০০ প্রভাবশালী ইসলামি স্কলারের মাঝে তাঁর স্থান অন্যতম।

এ মানুষটি জনগ্রহণ করেন জার্মানির রাজধানী বার্লিন শহরে। কিন্তু শিশু নোমান সেখানে ছয় মাসও থাকেননি। তাঁর বাবা পাকিস্তান দূতাবাসে কাজ করতেন বলে পরিবারসহ ছয় মাস বয়সে তাঁকে পাকিস্তানে চলে আসতে হয়। এখানেও তাঁর পরিবার দুমাসের বেশি থাকেননি; চলে যান সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় রিয়াদে, একটি পাকিস্তানি উর্দু মিডিয়াম স্কুলে। ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ছয় বছর তাঁর পরিবার রিয়াদে অবস্থান করেন। এরপর তাঁরা চলে যান আমেরিকায়। সেখানে তিনি খ্রিষ্টানদের পরিচালিত একটি হাইস্কুলে ভর্তি হন। ফলে সবকিছুই তাঁর কাছে ভিন্ন মনে হলো। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন পরিবেশ। বন্ধুরা সব ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন সংস্কৃতি লালন করে এবং চলাফেরা করে ভিন্নভাবে। এতে তাঁর কাছে অনেক অসহায় লেগেছিল তখন। প্রায় দুবছর পর্যন্ত তিনি কোনো মুসলিমের দেখা পাননি। শুক্রবারে ক্লাস থাকায় দুবছর তিনি জুমার সালাতও পড়তে পারেননি। অথচ তখন তিনি হাইস্কুলের ছাত্র। তাঁর বন্ধুদের আচার-আচরণের মধ্যে নৈতিকতা ও ধর্মের কোনো ছোঁয়া ছিল না। ফলে তিনিও ধীরে ধীরে তাদের আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁকে বাধা দেয়ার কেউ ছিল না; এমনকি তাঁর পরিবারও না। একসময় তাঁর মাঝে প্রবল অপরাধবোধ জেগে উঠে। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। হয় তাঁকে ধর্ম ত্যাগ করতে হবে, না হয় স্কুল ত্যাগ করতে হবে। দুর্ভাগ্য, অন্য কোথাও ভালো স্কুল নেই বলে পরিবার তাঁকে স্কুল ত্যাগ করতে দিল না। স্কুল শেষে তিনি কলেজে ভর্তি হলেন। আগের মতোই বন্ধুদের সাথে চলাফেরা, সবকিছু। এবার তিনি আস্ত নাস্তিক হয়ে গেলেন। প্রায় দুবছর তিনি নাস্তিকতার চর্চা করেন। ইসলাম থেকে তখন তিনি অনেক অনেক দূরে চলে গেলেন।

তারপর সময় হলো ফিরে আসার। নোমান আলী খান ইসলামে ফিরে আসলেন আগের চেয়ে শতগুণ গতিতে। হঠাৎ একদিন আমেরিকান মুসলিম স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের (MSA) দুজন সদস্যের সাথে তাঁর দেখা হয়।

তাঁরা নিজেদের মধ্যে কুরআনের আলোচনা করছিলেন; তিনি তা শুনছিলেন। যদিও এসব ধর্ম-কর্মের আলাপ তাঁর কাছে তখন ভালো লাগত না। তাঁরা নিজেরাই নোমান আলী খানের সাথে পরিচিত হলেন এবং ছায়ার মতো তাঁর সাথে চলাফেরা শুরু করলেন। তবে তাঁরা কখনো সরাসরি নোমান আলী খানকে কুরআন পড়তে কিংবা সালাত আদায় করতে বলেননি। এমনকি কখনো ইসলামের দাওয়াতও দেননি। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন তাঁরা নোমান আলী খানের সাথে সময় কাটাতে লাগলেন। এতেই নোমান আলী খানের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়।

একদিন তাঁদের একজন নোমান আলী খানের সামনে সালাত পড়লেন। নোমান আলী খানের কাছে খুব খারাপ লাগল। কারণ, তিনি সালাতের অনেক কিছুই ভুলে গেছেন দুবছরের নাস্তিকতার কারণে; এমনকি মাগরিবের সালাত কয় রাকাত, তিনি ভুলে গেছেন। নিজের অজান্তেই তিনি মুসলিম স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের এ দুজন ভাইকে বন্ধু ভাবতে লাগলেন এবং তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতেও লাগলেন। ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে সচেতনতা বাড়তে থাকে। তিনি কুরআনের অনুবাদ পড়া শুরু করলেন। আল্লামা ইউসুফ আলীর ইংরেজি অনুবাদ পড়তে লাগলেন।

কিন্তু অনুবাদের মাধ্যমে কুরআন বুঝা খুবই কষ্টকর। কোথায় বাক্যের শুরু আর কোথায় বাক্যের শেষ- কিছুই তিনি বুঝতে পারছিলেন না। কেন আল্লাহ হঠাৎ করে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে চলে যান- এসব কিছুই তিনি অনুবাদ পড়ে বুঝতে পারেননি। তখন তিনি ভালোভাবে কুরআন বোঝার জন্যে গুগল সার্চ করতে লাগলেন। ইন্টারনেটে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রচুর লেকচার পেলেন। কিন্তু কুরআনের ধারাবাহিক কোনো আলোচনা তখনো তিনি পাননি।

কুরআনের ধারাবাহিক আলোচনা প্রথম তিনি শুনেন তাঁর মহল্লার একটি মসজিদে। রমজান মাস উপলক্ষে সে মসজিদে পাকিস্তান থেকে একজন আলেম আসেন। তাঁর নাম ছিল ইমাম ডক্টর আব্দুস সামি। তিনি প্রতিদিন এক পাঠ করে কুরআনের অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত তাফসির করতেন। সকালে দুই ঘণ্টা, বিকালে চার ঘণ্টা এবং তারাবির পর রাত ১০টা পর্যন্ত কুরআনের ধারাবাহিক আলোচনা হতো। নোমান আলী খান ডক্টর আব্দুস সামির সকল আলোচনায় অংশ নেন। এভাবে তিনি সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসির শুনে শেষ করেন। কুরআনের এই ধারাবাহিক আলোচনা শুনে তাঁর কাছে মনে হয়েছে, তিনি এবারই প্রথম কুরআন শুনেছেন। এতে কুরআনের প্রতি তাঁর ভীষণ আগ্রহ জন্মে।

তিনি তাঁর উস্তাদ ডক্টর আব্দুস সামিকে বলেন, ‘আপনি যেভাবে তাফসির করেছেন, আমিও সেভাবে তাফসির করতে চাই’। ডক্টর আব্দুস সামি তাঁকে বললেন- ‘তাহলে আগে আরবি শেখো’। নোমান আলী খান তাঁকে বললেন, ‘আমি থাকি নিউইয়র্কে, সারাদিন কাজ থাকে, কলেজে যেতে হয়, আমি কীভাবে সৌদি আরব গিয়ে আরবি শিখব?’ ডক্টর আব্দুস সামি (এখনও জীবিত আছেন ও একটা ফাউন্ডেশনও আছে পাকিস্তানে) তাঁকে বললেন- ‘তুমি আগামী সপ্তাহ থেকে এ মসজিদে আমার আরবি ক্লাসে আসতে পার’। এভাবে তিনি ডক্টর আব্দুস সামির কাছে আরবি শেখা শুরু করেন।

পরবর্তীকালে তিনি ডক্টর আব্দুস সামির ব্যাপারে স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমি তার কাছে গিয়ে কুরআন তাফসির শুনতাম। আমার জীবনে এরকম কুরআনের আলোচনা আমি শুনিনি। তাঁর আলোচনা শুনে মনে হতো এই বুঝি এখনি কুরআন নাখিল হচ্ছে আমার উপর, আমারই বিভিন্ন বিষয়ে। এতটাই জীবন্ত ছিল আল্লাহর বাণীর যেসব আলোচনা। এই তাফসিরই তাকে আরবি শেখার দিকে উদ্বুদ্ধ করে, আল্লাহর দিকে গভীরভাবে ফিরে আসতে সহায়তাস্বরূপ কাজ করে।

তিনি আরবি ব্যাকরণ শিখেন পাকিস্তানে। সেখানে তিনি ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় জাতীয় পর্যায়ে মেধা তালিকায় প্রথম ১০ জনের মধ্যে স্থান দখল করেন। কিন্তু আরবিতে তার গভীর পড়াশোনা শুরু হয় ১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ডক্টর আব্দুস সামি-এর তত্ত্বাবধানে। ডক্টর আব্দুস সামি পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের কুরআন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, যিনি মাঝে মাঝে আমেরিকাতে যেতেন আরবি শিক্ষা এবং কুরআনের তাফসিরের উপরে গভীরতাপূর্ণ বক্তব্য রাখতে। তার অধীনে পড়াশুনায় নোমান আলী খান আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের উপরে তীক্ষ্ণ এবং গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি পরবর্তীকালে ডক্টর আব্দুস সামির কাছে আরও উপকৃত হন তার সম্পূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতিকে আত্মস্থ করে, তিনি ডক্টর সামির করা কাজগুলোকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন তার নিজের ছাত্রদের উপকারের জন্য।

আরবি শেখা অবস্থায় তিনি ইন্টারনেটে খুঁজতে খুঁজতে একদিন পেয়ে গেলেন ড. তারিক আল-সোয়াইদানের কুরআনের মুজিয়া বিষয়ক প্রায় ১৫ ঘণ্টার একটি ভিডিও সিরিজ আলোচনা। এটি ছিল আরবিতে। তিনি রাতদিন এগুলো শুনতে থাকলেন, কিন্তু তেমন কিছুই বুঝতেন না। পরে সম্পূর্ণ লেকচারটা লিখে ফেললেন। অভিধান থেকে প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ বের করলেন।

এভাবে আস্তে আস্তে তিনি আরবি লেকচার বুঝতে শুরু করলেন। এর কিছুদিন পর তিনি ইন্টারনেটে পেলেন শাইখ মুতাওল্লিকে। তাঁর লেকচারগুলো নোমান আলী খানকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করে। এরপর পেলেন কুরআনের উপর লেখা ডা. ফাদেল আল সামারাইয়ের বিভিন্ন বই ও বক্তৃতা। এগুলো পেয়ে তাঁর কাছে মনে হলো, তিনি জ্ঞানের সাগর পেয়ে গেছেন। তিনি এসব পড়তে ও শুনতে শুরু করলেন। একের পর এক স্কলারকে আবিষ্কার করলেন, আর তাঁদের থেকে জ্ঞান আহরণ করতে থাকলেন। দিনের পর দিন পরিশ্রম করলেন। নিজেকে নিজে বারবার বাধ্য করলেন- যেভাবেই হোক আরবি শিখতে হবে, আরবি বুঝতে হবে। মানুষ যা চায়, তা পায়। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নোমান আলী খান আরবি ভাষা ও কুরআনের ওপর অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। চমৎকার উপস্থাপনা, যুক্তিযুক্ত কথা, সহজ-সরল পদ্ধতির কারণে পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ আজ কুরআন শেখার জন্যে তাঁর কাছে ভিড় করছে। কেবল অনলাইনে বর্তমানে ১০ হাজারেরও বেশি তরুণ তাঁর কাছে কুরআন ও আরবি ভাষা শিখছে।

আরবি ভাষায় কুরআন উপলব্ধির ব্যাপারে তিনি বলেন—

‘কুরআনের এই অলৌকিকতার মাঝেই যে অনিন্দ্য হেদায়েত রয়েছে, শুধুমাত্র কুরআনের অনুবাদ পড়ে কোনোভাবেই তা আহরণ করা সম্ভব নয়। কারণ, অনুবাদে আসতে পারে কিছুটা মেসেজ কিন্তু আল্লাহর অলৌকিকত্ব ও তাঁর বাণীর যে গভীরতা সেটা কোনোভাবেই আসে না।’

তিনি সিদ্ধান্ত নেন- যত কষ্ট করে তিনি ইসলাম ও কুরআন শিখেছেন, ততটা কষ্ট যাতে অন্য কোনো মুসলিমের করতে না হয়, সেজন্যে তিনি অনলাইনে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। সিদ্ধান্তানুযায়ী ২০০৫ সালে তিনি বাইয়্যিনাহ ইসটিটিউট নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন এবং বাইয়্যিনাহ টিভি নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেন। এই সাইটে কুরআনের সৌন্দর্য, আরবি ভাষা ও ইসলামের ইতিহাসের উপর বর্তমানে পাঁচ শতাধিক ভিডিও ক্লাস রয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে বাইয়্যিনাহ টিভি নামে বিশ্বব্যাপী একটি চ্যানেলও চালু হবে। মূলত দুটি উদ্দেশ্যে তিনি এসব কাজ করছেন। প্রথমত, মানুষের জন্যে আরবি ভাষাকে একেবারে সহজ করে তোলা; যাতে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে যে কেউ ইচ্ছা করলেই আরবি ভাষায় দক্ষ হয়ে যেতে পারে। তিনি বাইয়্যিনাহ টিভিতে চমৎকার চমৎকার কিছু কৌশলে মানুষকে আরবি শেখান। যেহেতু তিনি অনেক সংগ্রাম করে আরবি শিখেছেন, তাই তিনি জানেন, কীভাবে শেখালে মানুষ তাড়াতাড়ি আরবি ভাষায় দক্ষ হতে পারে। তাঁর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো- মানুষকে কুরআনের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। তাঁর বিশ্বাস মানুষকে আগে আরবি শেখানের ভয় দেখালে সে কখনো কুরআনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না। তাই মানুষকে আগে কুরআনের স্বাদ পাইয়ে দিতে হবে। তারপর মানুষ নিজ থেকেই আরবি শিখতে চাইবে, যেমনটি স্বয়ং তাঁর নিজের ক্ষেত্রে ঘটেছে।

তিনি মনে করেন, তাঁর মতো লক্ষ-লক্ষ তরুণ দিশেহারা হয়ে আছে। তাদের কাছে একবার যদি কুরআনের মুজিয়া তুলে ধরা যায়, তাহলে তাদের জীবনই পরিবর্তন হয়ে যাবে।

অনেকে অভিযোগ করে, আধুনিক তরুণরা কুরআন পড়ে না, আরবি পড়তে চায় না। নোমান আলী খান এমন অভিযোগ করেন না। তাঁর কথা হলো, ‘আমরা যদি তরুণদের জন্যে আরবি ভাষাকে সহজ করে দিতে পারতাম, অবশ্যই তারা আরবি শিখত। আমরা যদি কুরআনকে তাদের কাছে সহজ ভাষায় পৌঁছে দিতে পারতাম, অবশ্যই তারা তা গ্রহণ করত। কারণ, ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। সবাই বলে, আরবি ভাষা ও কুরআন শেখার জন্যে আমার কাছে এসো; কিন্তু আমি নিজেই কুরআন শেখানোর জন্যে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হতে চাই।’

দীর্ঘদিন অযত্নে পড়ে থাকলে শক্তিশালী লোহাতেও মরিচাতে পড়ে ক্ষয়ে যায়। একজন মুসলমানের ইমানের যত্ন না নিলে তেমনি কালবের উপরে প্রলেপ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যেতে থাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস- আমাদের আত্মা। একটা প্র্যাক্টিসিং মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েও আমাদের অনেকেই ইসলাম থেকে, আল্লাহর ভালোবাসা থেকে দূরে সরে যায়। ফলে কোনো কাজেই শান্তি থাকে না, কোনো কিছুতেই স্বস্তি পাওয়া যায় না। জীবন তখন যেন ছন্নছাড়া হয়ে যায়। ফলে জীবনের প্রকৃত অর্থ হারিয়ে যায়।

এসব বিবেচনায় উস্তাদ নোমান আলী খানের লেকচারের মাঝে রয়েছে আত্মিক জ্ঞানের, আল্লাহর দ্বিন উপলব্ধির সুন্দরতম দিক, যেগুলো জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক এবং অর্থপূর্ণ। ফলে এসব আলোচনার মাধ্যমে আমাদের আল্লাহরকে ভুলে যাওয়া ক্ষুদ্র আত্মা এক অন্য দিগন্তের খোঁজ পায়, আল্লাহর দিকে পুণরায় ফিরে আসার প্রেরণা জোগায়।

উস্তাদ নোমান আলী খানের অনন্য বিশেষত্ব কী? দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুই মনে হয়- এটা কেন এমন, ওটা কেন অমন হয়, কেন এসব এমন হয় না, সবকিছু এরকম কেন হয় টাইপের। এটা নিশ্চিত যে, এইসবের পরিষ্কার উত্তর আমাদের রব আল্লাহ তায়ালার দেয়া জীবনবিধানে পরিষ্কারভাবেই আছে।

কিন্তু সেগুলো কীভাবে বুঝতে হয়, সেগুলোর গূঢ় কারণ কী? কীভাবে মনের এই সময়গুলোকে ‘ডিল’ করতে হয় তা আমাদের মতো অধিকাংশদের কাছেই অজানা। এসব প্রশ্নগুলো দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির যার সাথে আত্মিক বিশ্বাস যুক্ত, এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর যারা অমন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু নোমান আলী খানের লেকচারে সে সবের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক উত্তর রয়েছে। ফলে আমাদের মতো যুবকদের মনে জেগে ওঠা সাধারণ ও সমস্যামূলক অনেক জিজ্ঞাসার অসাধারণ সুন্দর সমাধান পাওয়া যায় উস্তাদের কথায়।

আমাদের অনেকেরই জীবনের একটা বাস্তব অথচ অমসৃণ অভিজ্ঞতা হলো সাধারণত কিশোর-তরুণরা গড়ে ওঠার সময়ে দ্বিন-ইসলামসংক্রান্ত প্রচুর প্রশ্নের সম্মুখীন হয় মনে মনে। হতে পারে সেটা পর্দা নিয়ে, কোনো ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন নিয়ে, ফিকহ অথবা ধর্মীয় তত্ত্বসংক্রান্ত প্রশ্ন, হয়তো কোনো অশ্লীল বিষয়কে কীভাবে ডিল করতে হবে তা নিয়ে, অথবা কীভাবে দান করতে হয়, নিয়্যাত কেমন থাকা উচিত- এরকম হাজারো প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছে করে। অথচ এই বিশ্বাসী তরুণ-তরুণীরা উত্তর না পেয়ে শেষে ভুল করতে থাকে। একদিন হয়ত তাদের ইচ্ছেটাই হারিয়ে যায়... কুরআনের স্বতঃস্ফূর্ত পড়াশোনা, ইসলামকে তরুণ প্রজন্মের

কাছে সুন্দর করে উপস্থাপনার আয়োজন বাংলাদেশে, আমাদের সমাজে খুবই কম। এই অদ্ভুত অবস্থায় আমার মতো ছেলেদের জন্য অশেষ রাহমাত অনলাইনের রিসোর্সে পাওয়া স্বপ্নাররা- যারা তরুণ প্রজন্মের সাথে খোলামেলা আলাপ করেন, কীভাবে চিন্তা করতে হবে শেখান, কীভাবে ভাবতে হয় সেটা শেখান। আর সেগুলোর ভিডিও অ্যাভেইলবল পাওয়া যায় ইন্টারনেটে। এসবের মাঝে উস্তাদ একজন অন্যতম শিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হন। বস্তুত হিদায়াতের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা।

উস্তাদ নোমান আলী খানের বক্তব্যের সুন্দর দিক হলো, তিনি সাধারণ আর সরল ভাষায় তরুণদের বোধগম্য হবার মতো করে বিষয়গুলো আলোচনা করেন। তার একেকটা লেকচার শোনার পর ওই বিষয়ক খটকা এবং প্রশ্ন থাকে না এবং পালন করার ব্যাপারে সন্দেহ আর অজুহাত থাকে না। এইটুকু বুঝতে হলে হয়তো আমাদেরকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়তে হতো। এই সহজ সরল অথচ গভীর ও বহুমুখী প্রজ্ঞার কারণে আমাদেরকে আল্লাহর বাণী আরও কাছে টানে, আল্লাহর দ্বীন পালনে নিজেদের আরও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

উস্তাদ নিজেই একটি ঘটনা তুলে ধরেছিলেন যেখানে আমরা উস্তাদের আল্লাহর বাণী আল-কুরআন মাজীদের আলোচনায় তার অনন্যতা উঠে আসে।

তিনি বলেন, অনেক মা তাদের সন্তানকে জোর করে তার লেকচার ও সেমিনারে পাঠান বা নিজে নিয়ে আসেন, যাতে করে তারা তার লেকচার শুনতে পারে ও ইসলামের পথে আসতে পারে। কিন্তু একবার যখন উস্তাদের কুরআনের আলোচনা শুনে, এরপর অনেকেই আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেছেন- আমি যেন এই জীবনে এই প্রথম আল্লাহর বাণী শ্রবণ করলাম! এত গভীর ও অলৌকিকতার সহিত এর আগে আমি আর কখনোও শুনিনি। এরপর থেকে নিজেরাই আসত! কী অসাধারণ চমৎকারিত্বের বর্ণনা হলে এই সব প্রায় বখে যাওয়া, ইসলামের প্রতি অনিহাপ্রবণ ছেলে-মেয়েরা নিজ ইচ্ছায় আসে ও অন্যদের নিয়ে আসে উস্তাদ নোমান আলী খানের সেমিনার ও লেকচার শুনতে!

মুসলিম উম্মাহর ব্যাপারে অনেকে যেখানে কেবল অভিযোগ আর সমস্যা চিহ্নিত করে, সেখানে নোমান আলী দেখেন সম্ভাবনা ও স্বপ্নের দ্বার। তিনি তরুণদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা দেখতে পান। উম্মাহর ৭০ ভাগ তরুণকে যদি কেবল সঠিক অনুপ্রেরণা দেয়া যায়, তাঁর বিশ্বাস, বিশ্বের চেহারাটাই পাল্টে যাবে। তিনি মনে করেন- মুসলিমদের দায়িত্ব হলো কেবল তরুণদের কাছে উন্নত ও সহজ পদ্ধতিতে কুরআনের বাণী পৌঁছে দেয়া; বাকি দায়িত্ব আল্লাহর। তিনিই সব করবেন। একই মাটিতে একই বৃষ্টির পানি পড়ার পরেও যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন ফুলের জন্ম হয়, একই অহী মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারলে সেরকম হাজার রকমের সম্ভাবনা ও পরিবর্তনের সূচনা হবে। নোমান আলী খানের চিন্তাভাবনা সব তরুণদের জন্যেই। এ কারণেই সম্ভবত সারা পৃথিবীর তরুণরা নোমান আলী খানকে তাদের জন্যে আদর্শ মনে করে। তাঁর বক্তব্যগুলো সারা বিশ্বের তরুণদের কাছে এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে, বিশ্বের নানা প্রান্তের তরুণরা তাদের নিজেদের ভাষায় নোমান আলী খানের বক্তব্যগুলো ভাষান্তরিত করছে। বাংলা ভাষায় তাঁর ১০০ টিরও অধিক বক্তৃতা ডাবিং, সাবটাইটেল, নোট এবং আর্টিকেল হিসাবে পরিবেশন করেছে আমাদের NAK Bangla ওয়েবসাইট। আল-কুরআনকে দর্শকদের সামনে জীবন্ত করে তোলার ক্ষেত্রে সত্যিই নোমান আলী খান এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এবং একটি অসাধারণ প্রতিষ্ঠান।

পরিশিষ্ট : শরঈ সম্পাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালায় জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর।

নোমান আলী খানের লেকচার থেকে চয়নকৃত কিছু আলোচনার মলাটবদ্ধ রূপ 'বন্ধন'-এর শরঈ সম্পাদনা সমাপ্ত হলো। সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে কাজগুলো আমাকে করতে হয়েছে গুরুত্বের সাথে সে বিষয়ে কিছু কথা বলে নিই। যাতে করে পরিবর্তনগুলোর বিষয়ে পাঠক একটা ধারণা লাভ করতে পারেন।

এই বইটিতে করা সম্পাদনার কাজগুলোকে মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক, যা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এমন বিষয়গুলো আবার দুই ধরনের। প্রথম হলো, যেগুলোতে শরীয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তি উঠার সুযোগ আছে। দ্বিতীয় হলো, শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক বিচারে সমস্যা না থাকলেও বাংলাভাষী মানুষদের পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় তা না থাকাটাই উত্তম মনে হয়েছে। দুই, আয়াতসমূহের আরবি পাঠ সংযোজন, এর অনুবাদ সংযুক্তকরণ ও উপস্থাপনগত সৌন্দর্যের দিক লক্ষ্য রেখে কোনো কোনো বাক্যকে একটু-আধটু পরিমার্জন।

এর বাইরে এক জায়গায় প্রয়োজন মনে হওয়ায় টিকা যুক্ত করা হয়েছে। যাতে করে পাঠকের মধ্যে কোনো ভুল জানা বা অর্ধ-জানা তৈরি হতে না পারে। মূল পাণ্ডুলিপির বিষয় সূচিতেও কিছু রদবদল করা হয়েছে। হৃদয়গ্রাহী আলোচনা ও কিছুটা রক্ষা আলোচনাকে সমতা রক্ষা করে সাজানো হয়েছে। এই ছিল শরঈ সম্পাদনার মোটামুটি বর্ণনা।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। প্রসঙ্গের মূল ফটকে প্রবেশ করার আগে প্রস্তুতিমূলক কিছু কথা আরজ করব। আশা করি পাঠক এতে চিন্তার খোরাক পাবেন এবং নিজেদের পাথেয় হিসেবে তা গ্রহণ করে নিবেন।

মানুষকে যাচাই-বাছাই করার ইসলামসম্মত শাস্ত্রটার নাম হচ্ছে ইলমুল জারহি-ওয়াত তাদীল। ব্যক্তি নির্ণয় বিদ্যা হিসেবে এটি স্বীকৃত ও সমাদৃত। এই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের একটা কথা খুবই প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। তা হলো, লি কুলু ফল্লিন রিজাল। অর্থাৎ প্রত্যেক শাস্ত্রের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন। সেই ব্যক্তিদের কাছ থেকেই ওই শাস্ত্রের বিষয়গুলো গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু যিনি যে শাস্ত্রের পণ্ডিত, তার দক্ষতা সেই শাস্ত্রতেই, সুতরাং এর বাইরের অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে তার মতামত অতটা গ্রহণযোগ্যতা ও স্বীকৃতি পাবার অধিকার রাখে না। এই বিষয়টিকে অনেকেই তাদের গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। তাদের মধ্যে ভারতের বিশ্ববিখ্যাত আলেম, ফকিহ, মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল হাই লাখনবি রহ. অন্যতম।

এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের বাংলা ভাষা হুবহু তুলে ধরছি:

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি স্থানের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের কথা ও প্রতিটি শাস্ত্রের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের ব্যক্তিবর্গ তৈরি করেছেন। তাঁর সৃষ্টিজগতের প্রত্যেককে বিভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্যাবলী প্রদান করেছেন। যা একজনের মধ্যে পাওয়া যায়, অন্যজনের মধ্যে পাওয়া যায় না। যেমন মুহাদ্দিসদের মধ্যে অনেকে এমন রয়েছেন, যারা কেবল হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু হাদীসের অন্তর্নিহিত মর্ম বোঝা ও সেখান থেকে মাসআলা-মাসায়েল উদ্ঘাটন করার মতো সক্ষমতা তাদের থাকে না। আবার এর বিপরীতে অনেক ফুকাহায়ে কেরাম রয়েছেন যারা কেবল মাসআলা-মাসায়েল মুখস্ত করেন। হাদীস বর্ণনায় তারা দক্ষতা রাখেন না। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান দেয়া এবং তাদের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া।’

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি উদাহরণ পেশ করা হয় যার মাধ্যমে তিনি হলেন ইমাম গাজালী রহ.। তাঁর রচনা করা ‘ইহয়াউ উলুমিদীন’ একটি জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ। এটি রচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর অধিক পঠিত গ্রন্থগুলোর অন্যতম। কিন্তু এই গ্রন্থে উল্লিখিত অনেক হাদীসের উপরই প্রাজ্ঞ হাদিসবিশারদগণ আপত্তি করেছেন। সেগুলোর কোনোটিকে বাতিল আর কোনোটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে অবহিত করেছেন। এই গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসগুলোর অবস্থা ও সূত্র নির্ণয় করে আল্লামা ইরাকী রহ. একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার নাম হলো ‘আলমুগনী আন হামলিল আসফারি ফিল আসফার ফি তাখরিজি মা ফিল ইহয়াই মিনাল আখবার’।

আল্লামা লাখনবী রহ. এই বিষয়ে বলছেন, ‘ইহয়াউ উলুমিদীনের গ্রন্থাকারের ব্যাপারটাই চিন্তা করুন। তার মর্যাদা ও অবস্থানের বিষয়টি তো স্বীকৃত। তবুও দেখা যায় তার গ্রন্থে তিনি এমন কিছু হাদীস নিয়ে এসেছেন যার কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং এসব হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। যেমনটা আল্লামা ইরাকীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে বুঝে আসে।’

মোটকথা, আমি যে বিষয়টি বোঝাতে চাচ্ছি তা হলো, সবার মধ্যে সব ধরনের বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা থাকে না। আল্লাহ একেকজনকে একেক ধরনের বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা দান করেন। তো যে বিষয়ে যার যোগ্যতা আছে সেই বিষয়ে তাকে স্বীকৃতি দেয়া ও সেই ক্ষেত্রে, আবারও বলছি, ‘সেই ক্ষেত্রে’ তাকে গ্রহণীয় মনে করা যেতে পারে। বাকি এর বাইরে অন্যান্য বিষয়ে তার মন্তব্য অতটা গ্রহণযোগ্যতা রাখে না। সেটা যদি সঠিক হয় তবে তো ভালো। অন্যথায় সম্মানের সাথে তা বর্জন করতে হবে।

এবার চলুন মূল ফটকে প্রবেশ করি। আপনি যদি নোমান আলী খানের জীবনী পড়েন, তাহলে দেখবেন যে, তাঁর মূল পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার ক্ষেত্র হচ্ছে কুরআনের ভাষা তথা আরবি ভাষা ও সাহিত্যে। পবিত্র কুরআনের অলংকারিক সৌন্দর্যের বর্ণনা, নান্দনিকতার দিকগুলোর উপস্থাপনা ও বিভিন্ন আয়াতের আলোকে আমাদের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ইত্যাদিকে ব্যাখ্যা করা ও সামাজিক নানা অসঙ্গতির সংশোধন কল্পে নাসিহাহ প্রদান করা।

সে হিসেবে তার মূল অবস্থান হচ্ছে, তিনি একজন দায়ী ও কুরআনের মুজিয়া তথা ভাষা-সৌন্দর্যের অভিলষী ও মানুষের মাঝে কুরআনের বাণী ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টাকারী। আরবি ভাষা শেখানোও তার পছন্দের একটা কাজ। ফিকহ-ফতোয়া বা হাদীস শাস্ত্র তার পাণ্ডিত্যের বিষয় নয়। এই জায়গাটা স্পষ্ট হলেই আমাদের জন্য কর্মপন্থার পদ্ধতি বোঝাটা সহজ হয়ে যাবে।

নোমান আলী খান যেহেতু একজন মানুষ সুতরাং তার ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, কিছু ভুল মানুষ করে থাকে তার চিন্তাগত অবস্থান থেকে। তো তিনি যেহেতু পশ্চিমা দেশে বেড়ে উঠেছেন এবং সেখানকার আবহাওয়াতে তিনি দাওয়াতি কাজ করেন ফলে সেখানকার পরিবেশগত কিছু প্রভাবও কখনো কখনো তাকে প্রভাবিত করে। যা অনেক সময় তার আলোচনাতেও প্রকাশ পায় যায়। সুতরাং এই বিষয়টার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

এর জন্য আপনাকে যে কাজগুলো করতে হবে তা হলো, দিনের মৌলিক জ্ঞানকে আরও শাণিত করা। কুরআনের জ্ঞান অর্জনের জন্য শুধু লেকচারের উপর সীমাবদ্ধ না থেকে নির্ভরযোগ্য তাফসির গ্রন্থগুলোও অধ্যয়নের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা। সালাফদের বুঝ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের কর্মপন্থা, তাদের আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ে যত বেশি পারা যায় ধারণা অর্জন করা। এবং এর আলোকেই পরবর্তীদের বক্তব্যকে নিরীক্ষণ করা।

কারণ, পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসরণের ব্যাপারে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. লোকদেরকে নসিহত করে বলতেন, 'তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি কারও অনুসরণ করতে চায় তবে যেন সে তাদের অনুসরণ করে যাদের মৃত্যু হয়ে গেছে। কারণ, জীবিতরা ফিতনা থেকে মুক্ত নয়।'

লেকচার শোনাটাও দিনের জ্ঞান বৃদ্ধি করার একটা আধুনিক মাধ্যম। তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এটি দিন শেখার মৌলিক কোনো মাধ্যম নয়। বরং সহায়ক মাত্র। তাই যারা প্রচুর পরিমাণে লেকচার শুনে তাদের প্রতি আমার পরামর্শ হলো, লেকচার শোনার সাথে সাথে আলেমদের সঙ্গেও সরাসরি সম্পর্ক সৃষ্টি করুন। সম্পর্ক যদি মোটামুটি থেকে থাকে তবে তাকে আরো উন্নত করুন। তাদের থেকে সরাসরি দিনের জ্ঞান অর্জন করতে বেশি সচেষ্ট হোন। এটাই দিন শেখার সুন্যাহসম্মত পদ্ধতি। আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন সরাসরি কারও সংস্পর্শে দিনের জ্ঞান অর্জন করা আর ডিভাইসের সহায়তায় তা অর্জন করার মধ্যে কত বিস্তর ফারাক রয়েছে।

উপরে যে মতামত প্রদান করা হলো, তা একান্তই আমার। আর এই বইয়ের শরঈ সম্পাদনা করার মানে এই নয় যে, নোমান আলী খানের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার সব আলোচনার সাথে আমি সহমত পোষণ করি বা ঢালাওভাবে সব শ্রেণির শ্রোতার জন্য তার আলোচনা শোনাকে আমি সমর্থন ও উৎসাহিত করি। তবে উপকারী দ্বীনি জ্ঞান অর্জনকে আমি সবসময় উৎসাহিত করি।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে উপকারী জ্ঞান দান করুন। ক্ষতিকর জ্ঞান থেকে হেফাজত করুন। ভালো কাজগুলো কবুল করে নিন। মন্দ কাজগুলো ক্ষমার চাদরে ঢেকে দিন। আমীন।

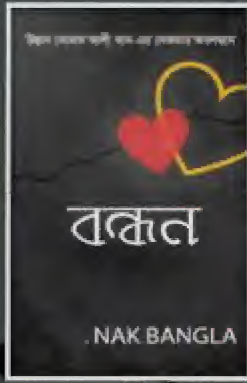
আবদুল্লাহ আল মাসউদ

১৫-০১-১৮

১. উমদাতুর রিআয়াহ ১/১৩

২. আলআজওয়িবাতুল ফাদিলা, আবদুল ফাত্তাহ আবু শুদ্দাহর টিকাসহ- ৩৩পৃ.

৩. জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী ২/৪৭



কী আমাদের পরিচয়?

আমরা কারও সন্তান, কারও জীবনসঙ্গী, আবার কেউ আমাদেরই সন্তান। পারিবারিক, সামাজিক, এমনকি আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে এই বন্ধনগুলোই আমাদের নানান পরিচয়ে পরিচিত করে। প্রতিটি পরিচয়ই আমাদের কোনো না কোনো বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই বন্ধনগুলোই আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের পরিচয়। এই বন্ধনগুলোই আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে সংজ্ঞায়িত করে। জীবনভর এসব বন্ধন নিয়েই তো আসলে এই আমরা।

জীবনের রঙে রঙিন, পার্থিব অথচ অপাংক্তেয়, একই সাথে অপার্থিব কিন্তু মায়াবি- এই অদ্ভুত বন্ধনগুলোর নিবিড় খুঁটিনাটি নিয়ে উস্তাদ নোমান আলী খান-এর মূল্যবান কথামালা কালির অঙ্করে জায়গা পেয়েছে 'বন্ধন' বইটিতে।

নিজেদের আপন সম্পর্কের মিষ্টতা-তিক্ততার ভাষাগুলোই জড়ো হয়ে বইয়ের পাতায় শব্দ হয়ে ফুঁটেছে 'বন্ধন' নামে।



গার্ডিয়ান

পা ব লি কেশন স

৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০।

www.facebook.com/guardianpubs

www.guardianpubs.com



ISBN: 978-984-92959-9-0